Vol. 52 | No. 1 | 2014

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বয়নে-বয়ানে বাংলা কবিতায় আবুল হোসেন

Volume	52
Issue	1
Year	2014
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	অনু হোসেন
Published online	October 1, 2014
DOI	10.62328/sp.v52i1.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v52i1.3
Pages	৫৯-৮৯
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বয়নে-বয়ানে বাংলা কবিতায় আবুল হোসেন

Check for updates

অনু হোসেন*

নতুন কবিতা লিখবেন, এই স্বপ্ন নিয়ে তরুণ বয়সে আবুল হোসেন (১৯২২-২০১৪) একদা কবিতার দিকে পথ হাঁটা শুরু করেছিলেন। নবীনদের প্রতি আস্থা ছিল তাঁর উচ্চণ্ড। বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ উচ্চাভিলাষও তিনি দেখেছিলেন এই নবীনদের ঘিরে। তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল — নতুন কবিতা লিখতে পারেন নতুনরা। পুরোনোরা মাঝে মাঝে ভালো লিখলেও নতুন লেখার ভঙ্গিটি চিরকালই করে গেছেন কোনো-না-কোনো নবীন কবি। (অনু, ২০০৩ : ১৭) নবীনরা লিখতে শুরু করেন নতুন সময়ের ভাষা ও অনুভূতির সমবায়ে। কবিতা লিখতে গিয়ে অনেক নবীন আবির্ভূত হন দোর্দণ্ড প্রতাপে। তাঁদের লেখার ভেতর আগামী দিনের সম্ভাবনার ছাপও থেকে যায়। নবীনদের কবিতা লেখার এই আবেগের আগুন সবার মধ্যে বেশি দিন জ্বলতে দেখা যায় না। কারোটা প্রথম দিকে আলো জাঁকিয়ে জ্বললেও একসময়ে হয় তা নিবুনিবু। কেউ হারিয়ে যান সময়ের ঝুলকালির ভেতর, কেউবা সৃষ্টির গুহা থেকে বেরিয়ে অন্য পথে হাঁটতে শুরু করেন। ফলে যাঁরা হৃদয়ের উত্তাপ দিয়ে একসময় যাত্রা করেন তাঁদের অনেকেরই আর এগোনো হয় না সামনের দিকে। এই প্রবণতা কমবেশি সব দেশেই চোখে পড়ে। একবার টি এস এলিয়টের (১৮৮৮-১৯৬৫) এক বন্ধু ২০-উত্তীর্ণ এক তরুণ কবির একটি ভালো কবিতা এলিয়টকে দেখে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। এলিয়ট বন্ধুকে উত্তরে সাফ জানিয়েছিলেন, 'ওকে ওর চল্লিশ বছর বয়সে আসতে বোলো, তখনো যদি কবিতা লেখে তবে যেন সে আমার সঙ্গে দেখা করে।' (সৈয়দ হক, ২০০৫, ভূমিকা : ১১) সদ্যতরুণ কবিকে নিয়ে এলিয়টের এই মন্তব্যের পেছনে একটিই কারণ। নবীনরা যাঁরা লিখতে শুরু করেন তাঁদের অনেকেই শেষপর্যন্ত লেখার উত্তাপ ধরে রাখতে পারেন না। ফলে আর লেখা হয়ে ওঠে না। নবীন থেকে প্রবীণ বয়স-অবধি আমৃত্যু কবি হয়ে বেঁচে থাকবেন — এলিয়ট এমন কবিকেই আহ্বান জানিয়েছেন। এলিয়টের এই আহ্বান আবুল হোসেনের ক্ষেত্রে ভীষণভাবে সত্য বলে প্রতিষ্ঠা পায়।

১৮ বছর বয়সে হৃদয়ের আগুন দিয়ে আবুল হোসেন লিখেছেন *নববসন্ত*। তখন ১৯৪০ সাল। কবির জন্মসাল ১৯২২ আর মৃত্যু ২০১৪। *নববসন্ত* লেখার পর তিনি ৭৪ বছরের জীবন পেয়েছেন। জানা যায়, আমরণ তিনি তাঁর লেখায় ও সৃষ্টিশীলতায় নবীন কবির আবেগে ছিলেন সপ্রাণ। *নববসন্ত* থেকেই তিনি সর্বহৃদয় দিয়ে চেয়েছিলেন, বাংলা কবিতার জমিতে আধুনিকতার হাওয়া লাগাতে। সে-লক্ষ্যে তাঁর স্বপ্ন ছিল, কবিতাকে নিয়ে আসতে হবে পরিমিতি ও মুখের ভাষার মধ্যে। ভাষা ও বিষয় নিয়ে অযাচিত আরোপ-করা থেকে কবিতাকে মুক্তি দেওয়াই ছিল এই নবীন কবির বড় অভিলাষ। সেজন্য *নববসন্ত* লিখে দীর্ঘদিনের একঘেয়ে কবিতার ধারায় বসন্তের নতুন ফুল ফোটানোর সাহস বুকে নিয়েছিলেন। তাঁর সময়ে যাঁরা লিখতে শুরু করেছিলেন তাঁদের সকলেই প্রায় চলে গেছেন, সম্ভবত আবুল হোসেন সবার পরে। যতদিন বেঁচে ছিলেন লেখা তাঁর থেমে যায়নি। আমরণ

* লেখক, সাংবাদিক। পরিচালক, বি.ডি.জি. ফাউন্ডেশন।

তিনি আমাদের কাব্যজমিতে ফসল ফলিয়ে গেছেন। এই ফসলও পূর্ণতা পেয়েছে নবীন বয়সের ক্ষিপ্রতায়।

আবুল হোসেন স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ ও সপ্রতিভ চিন্তার অপূর্ব এক মিলন ঘটাতে পেরেছিলেন। তাঁর কবিতা পাঠ করলে মনে হবে আবেগের তারল্য যেমন চিন্তার ক্ষেত্রকে রুদ্ধ করে দেয়নি, তেমনি চিন্তার আতিশয্য সপ্রাণ আবেগকেও ঢেকে ফেলেনি। সবচেয়ে বড় কথা তিনি আবেগের সংবেদনাগুলোকে অনায়াসে রূপান্তরিত করতে পারেন শিল্পবোধে। *কবিতাসমগ্র আবুল হোসেন*-সম্পাদক মনজুরে মওলা (জ. ১৯৪০) সুচিন্তিতভাবে মন্তব্য করেছেন 'চিন্তা কবিতার উপাদান হয়ে যায় ও হতে পারে কেবল তখনই যখন তা আবেগে রূপান্তরিত হয়ে যায়, আবেগের সঙ্গে এক হয়ে যায়। কবিতার জন্ম হয় চিন্তা থেকে নয়, আবেগ থেকে। তাই চিন্তার আবেগে পাল্টে যাওয়া জরুরি হয়ে পড়ে। আবুল হোসেনের এমন কোনো কবিতা আছে কি, যেখানে চিন্তা আর শুধু চিন্তা থাকে না, আবেগ তাকে নিজের করে নেয়, — সে-আবেগ থেকে কবিতা জন্ম নেয়? আমার খুব একটা চোখে পড়ে না।' (মওলা, ২০১০ : ৪৯) কেউ যদি প্রশ্ন রাখেন চিন্তা না আবেগ — কোনটি কবিতার জন্য যথোপযোগী? কেবল চিন্তা দিয়ে যেমন কবিতার বোধ দানা বাঁধে না, তেমনি আবেগের মাত্রাকে বোধের দিকে উত্তীর্ণ করতে না-পারলে সে-কবিতা আধুনিকতার শর্ত রক্ষার পথে দ্বিধান্বিত হয়। আবুল হোসেন কবিতায় যে অনুভূতির রঙ লাগিয়েছেন সেখানে আবেগের ভরাডুবি ঘটতে দেখা যায় না। অনুভূতির ভেতর চিন্তার খোরাক যেমন আছে, প্রাজ্ঞতার ছাপও কোথাও কম নেই। পরিমিতিবোধ তাঁর সৃষ্টিসত্তার সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন সহকারী হিসেবে যুক্ত ছিল সর্বদা। কোনো লেখায় তারল্য বা আবেগের মাত্রাতিরিক্ত তাড়না তাঁকে পেয়ে বসেনি। ফলে পঙ্‌ক্তির ভেতর চিন্তা ও জীবনবোধের নানা আলোর ছটা সহজেই বেরিয়ে এসেছে। আবুল হোসেনের অনন্যতা সম্ভবত এখানেই।

আবুল হোসেন বাংলা কবিতার ভাষায় গদ্যের স্পর্শ লাগিয়েছেন। সমর সেন (১৯১৬-৮৭) তাঁর সমকালে কবিতা ও গদ্যের দূরত্ব অনেকখানি কমিয়ে এনেছিলেন। আবুল হোসেনও একইভাবে কবিতার ভাষাকে গদ্যের যতটা পারা যায় কাছাকাছি নিয়ে যান। তিনি যতটা সম্ভব পুনরাবৃত্তি উপেক্ষা করেছেন। পুনরাবৃত্তি যেন কবিতার পরিসরকে গ্রাস না-করে, কিংবা নিজের চারদিকে ঘুরেফিরে একই অনুভবের প্রকাশ না-ঘটায়, সেইদিকে তাঁর ছিল সযত্ন খেয়াল। তাঁর অভিমত, 'আমি তো খুব কম লিখি। আমি এমন জায়গায় পৌঁছে গেছি যে, আমি ইচ্ছে করলেই প্রতিদিন একটা দুটো কবিতা লিখতে পারি। কিন্তু সেভাবে কবিতা লিখলে সেটা অনেকটা অটোমেটিক লেখা হয়ে যায়। এবং তার মধ্যে প্রচুর পুনরাবৃত্তি চলে আসে। আমি এই পুনরাবৃত্তিকে উপেক্ষা করেছি। পুনরাবৃত্তি যেন আমার মধ্যে না আসে, আর আমি যেন আমার নিজের চারদিকেই বারবার প্রদক্ষিণ করে না-বেড়াই সেদিকে আমার লক্ষ্য ছিল। আমি যখন একটি কবিতা লিখছি সেখানে হয়তো একশ কবিতা লেখা যেত কিন্তু আমি মনে করেছি ওই একটি কবিতা লেখার পর আর কিছু লেখবার প্রয়োজন নেই।' (অনু, ২০০৩ : ১৭) তাঁর কোনো কোনো কবিতায় জীবনের বিচিত্র অনুভবের পাশাপাশি বিক্ষোভ বা প্রতিবাদের কথা যাই আসুক তা পুনরাবৃত্তিতে ক্লান্তিকর হয়ে ওঠেনি বা বিবৃতির উদ্ভাসে স্লোগানও হয়ে পড়েনি।

আবুল হোসেন পেয়েছিলেন দীর্ঘ-এক জীবন। নানামুখী টানাপড়েনের ভেতর দিয়ে কাটিয়ে দিয়েছেন তাঁর অনেকটা সময়। অনেক রোগশোক ও প্রিয়জনের মৃত্যু কবিকে বেদনাকাতর করেছে অগণিতবার। প্রথমটি মায়ের মৃত্যু। অল্প বয়সে কবিকে ছেড়ে যান মা। চল্লিশেও পৌঁছুতে পারেননি। উনচল্লিশে হঠাৎ করে তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। মায়ের মৃত্যুর সময় কবি নিজেও অসুস্থ ছিলেন। স্মল পক্স তাঁকে পেয়ে বসেছিল। মায়ের কথামতো ওই সময় তিনি অন্যত্র হাওয়া বদলাতে চলে যান। একদিন খবর পান, কবির মা মারা গেছেন। এরপর ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী তাঁর বাবাকে মেরে ফেলে। বাবার মৃত্যুর পর কবির দাঁড়াবার জায়গাটাও শেষ হয়ে আসে। তার পরের বিয়োগটা কবিকে সম্পূর্ণ গুঁড়িয়ে দেয়। সেটি কবির স্ত্রীর বিয়োগ। অকালে মারা গেলেন তিনি। এতসব বিয়োগব্যথার মধ্য দিয়ে কবি বেড়ে উঠেছেন। বেদনামাখা পেছনের দিনগুলো সম্পর্কে কবির অকপট প্রকাশ, 'আমার জীবনে কতবার যে আজরাইল এসে আমার চোখ বন্ধ করে একেবারে ওপারের সীমানায় নিয়ে গেছে তা বলতে পারব না। সব বারই আমি নিজে আজরাইলের হাত ছাড়িয়ে তাকে ফাঁকি দিয়ে ফিরে এসেছি। এটা আমার সৌভাগ্য। আমি বললাম, আমি নিজে তার হাত ছাড়িয়ে ফাঁকি দিয়ে চলে এসেছি। কিন্তু আমার মনে হয়, যে কেউ আমার হয়ে তার কাছ থেকে আমাকে ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছেন। তাই তাঁর কাছে ঋণ শোধ করবার তো কিছু নেই। তিনি তো সব ঋণের ঊর্ধ্বে।' (অনু, ২০০৩ : ১৭) এইসব হতোদ্যম ঘটনারাশির পরও ভেঙে পড়েননি, মুষড়ে যাননি কবি। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাগুলোকে তিনি সহজ-সুন্দরভাবে কবিতায় রূপ দিয়ে সার্বজনীন করে তুলেছেন। *কবিতাসমগ্রের* সম্পাদক মনজুরে মওলা তাঁর ভূমিকায় জানিয়েছেন, 'আবুল হোসেনের কবিতায় বারবার তাঁর নিজের জীবনের কথা শোনা যায়, মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁর বাবার শহীদ হবার কথা, তাঁর সন্তানদের কথা, তাঁর বন্ধুজনের কথা, ছোটোখাটো নানা ঘটনার কথা। নিজের একান্ত কথাকে তিনি সবার কথা করে তোলেন।' (মওলা, ২০১০ : ৫৩) একান্ত জীবনের টুকরো টুকরো ঘটনা ও ছবিকে তিনি নিতান্ত সহজভাবে কবিতায় অক্ষরবন্দি করেছেন। সম্পাদক কবির যুক্তিবোধকেও গুরুত্ব দিয়েছেন, 'আবুল হোসেনের লেখায় ভাবালুতা নেই বলেই আবুল হোসেন ব্যঙ্গ কবিতা লিখতে পারেন, লিখেওছেন। ব্যঙ্গ কবিতা লিখতে গেলে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ লাগে, অসঙ্গতি দেখার ক্ষমতা লাগে, হাসতে পারার শক্তি লাগে। অসঙ্গতি কেবল সে-মানুষই দেখতে পায়, যার মধ্যে যুক্তিবোধ কাজ করে। এ যুক্তিবোধ তাঁকে ভাবালুতার উল্টো দিকে দাঁড় করিয়ে দেয়। ব্যঙ্গ কবিতার ধারাটি বাংলা কবিতায়, সন্দেহ হয়, ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছে। এদিক থেকে আবুল হোসেন এক ব্যতিক্রম।' (মওলা, ২০১০ : ৫১) তিনি কবিতাকে সংগীতপ্রধান করেননি। কিছু কবিতা সংগীতময় হওয়ায় সুরের গায়কীর মধ্যে তার আবেদন ও মর্মার্থ ছড়িয়ে পড়ে; আবার আধুনিককালের অনেক কবিতা পাঠ বা উচ্চারণের মধ্যে কবিতার অন্তর্নিহিত অপরূপত্ব স্বয়ংক্রিয়ভাবে সঞ্চার করে। টি এস এলিয়ট তাঁর 'মিউজিক অব পোয়েট্রি' প্রবন্ধে প্রায় কাছাকাছি একটি মন্তব্য করেছেন, 'Some poetry is meant to be sung; most poetry, in modern times, is meant to be spoken.' [Frank, 1975 : 112) আবুল হোসেনের কবিতা দ্বিতীয় ধারার। সমকালের অনেক কবির মতো সংগীত-আধিক্য ও চিত্র-আধিক্য যেমন পূর্বাপর তাঁর কবিতার বুনটকে ছেয়ে ফেলেনি তেমনি

বিবৃতি-আধিক্য বক্তব্যধর্মী কবিতাও মেলে না তাঁর কাব্যাদর্শে। আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯৪৩-২০১০) এ প্রসঙ্গে যথাযথ মীমাংসা দিয়েছেন, 'কবিতার চিরকালীন যে দুই অস্ত্র, চিত্র ও সংগীত, তা থেকে দূরে অবস্থান করেও তিনি যা রচনা করেছেন তা কবিতা ছাড়া আর কিছু নয়। এই মনোভঙ্গি ও প্রয়োগ তাঁর নিজস্ব। এখানেই নিঃশব্দে তাঁর শক্তি ও সাহস।' (আবুদল মান্নান, ২০১১ : ১২৭)

সচেতনতা তাঁর কাব্যস্বভাবের অন্তর্গত। পাঠোত্তর আধুনিক কবিতার মাননির্ণয়ে তাঁর সজাগ ও নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর কবিতা ও আত্মবয়ানী লেখাগুলো পাঠ করলেই তা সুস্পষ্ট হয়। বহির্বিশ্ব ও স্বদেশের আধুনিক কবিতার রূপবৈচিত্র্য নিয়ে তাঁর একটি সম্যক পাঠ ও পাঠপরবর্তী আত্মোপম মূল্যায়ন ছিল। তিনি স্বীকারোক্তিমূলক কিছু লেখায় তাঁর এসব ধারণা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। বাংলা কবিতায় তিরিশি কবিরা আধুনিকতার সূত্রপাত করেছেন, তিনি তা কখনোই মনে করতেন না। আধুনিকতার একমাত্র উদ্গাতা-পুরুষ হিসেবে তিনি মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-৭৩) একক কৃতিত্বের কথাই বলেছেন, 'আধুনিক বাংলা কবিতায় আধুনিক শব্দটি খুব সুব্যবহৃত হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। আসলে আর কোনো ভালো নাম না-পেয়ে বাংলা কবিতা সংকলনের দুই সম্পাদক আবু সায়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এই শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। শব্দটি যতটা কালের কথা বলে ততখানি বিষয়ের নয়। আধুনিক বাংলা কবিতা বলতে যা আমরা বুঝি তা তিরিশের ছ-সাতজনের কবিতাকেই বুঝে থাকি। জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও সমর সেন — এঁরা সবাই একসঙ্গে লিখতে শুরু করেন এবং সেজন্যই এঁদের তিরিশের কবি বলা হয়। আধুনিক কবিতা নাম না-দিয়ে এই কবিতাকে তিরিশের কবিতা বলা যেত। আমার মনে হয় সেটাই ভালো হত। কারণ বাংলা কবিতায় আধুনিকতা তো তিরিশের এই কবিরাই আনেননি, এনেছিলেন অনেক আগে মাইকেল মধুসূদন দত্ত।' (অনু, ২০০৩ : ১৭) আধুনিকতা নিয়ে বিপুল সচেতনতাই সম্ভবত তাঁকে সজাগ ও সংহত আধুনিক কবি হওয়ার পথে পরিচালিত করেছে। সচেতন পাঠ ও চিন্তা ছিল বলেই শুরু থেকে আধুনিক কবিতাধারায় ভিন্ন পথ নির্মাণের স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি।

আবুল হোসেনের কবিতার একটি বড় গুণ তিনি কাব্যস্বভাবে কোনো অস্পষ্টতা ও রহস্যময়তা না-করে অনুভবকে কবিতার অনন্য বোধে নিয়ে যেতে পারেন। এ রকম শক্তি বাংলা কবিতায় আমরা খুব কম দেখি। *কবিতাসমগ্রের* সম্পাদক ভূমিকায় জানিয়েছেন, 'রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা কবিতাকে যাঁরা এগিয়ে নিয়ে গেছেন ও নতুন মাত্রা দিয়েছেন আমি মনে করি আবুল হোসেন তাঁদের একজন।' (মওলা, ২০১০ : ৫৪) সম্পাদক অস্পষ্টতা ও রহস্যময়তা প্রসঙ্গে জীবনানন্দ দাশের (১৮৯৯-১৯৫৪) 'আকাশলীনা' আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) 'সোনার তরী'র ইন্টারটেক্সচুয়াল রিডিংয়ের একটি সিদ্ধান্ত উপস্থিত করেছেন। এবং আলোচনার অন্তে বলেছেন, 'আকাশলীনার মতো কবিতা আবুল হোসেনের লেখায় নেই।' (মওলা, ২০১০ : ৫৩) অস্পষ্ট ছবি সম্পাদকের নন্দনবোধের কাছে গৌণ মানদণ্ডরূপে উপস্থিত হয়েছে। ডাইমেনশন প্রসঙ্গে আপাত অস্পষ্টতার বিষয়টি খুব স্বাভাবিকভাবে আসবেই। কবিতায় অস্পষ্টতা একটি প্যারাডক্সের

মতো। আপাতভাবে কোনো একটি ন্যারেশন কারো তাৎক্ষণিক বোধে অস্পষ্ট মনে হলেও গভীর বোধে তার ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা উপস্থিত হতেই পারে। তাই বলে আপাত অস্পষ্টতা কবিতাবিচারে কোনো ঊনতা সৃষ্টি করে না। তবে যাঁরা অস্পষ্টতার হাত ধরে কবিতায় চমক ও গিমিক সৃষ্টি করেন তাঁদের বিচার সময়ের হাতে।

কবি মুখের ভাষাকে তাঁর কবিতায় স্থান দিয়েছেন। যে ভাষা আমরা প্রতিদিন প্রয়োগ করি সে ভাষাই কবির দক্ষ হাতে নতুন মাত্রা পেয়েছে। সম্পাদকের একটি মন্তব্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, 'প্রতিদিন যে-শব্দ মানুষ নানাভাবে ব্যবহার করে, সেটি ছাড়া কবির আর কোনো পুঁজি নেই, সেই শব্দকেই কবি নতুন করে তোলেন, নতুন করে তুলে ভাষার সীমানা ও সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেন। কখন যে শব্দ কবির হাতে অন্য রকম হয়ে যায়, পাঠক তা টেরও পান না। সে-শব্দ পাঠকের চেতনায় মিশে যায়, তাঁর নিজের ভাষার সঙ্গে এক হয়ে যায়, সে-ভাষায় জায়গা করে নেয়।' (মওলা, ২০১০ : ২৯) আবুল হোসেন খুব সযত্নে তাঁর কাব্যবোধও ছন্দে গেঁথে দিতে পারেন। সম্পাদকের মন্তব্য, 'আবুল হোসেন ছন্দ নিয়ে কাজ করতে ভালোবাসেন। এখনকার কবিরা যেমন বেশিরভাগ সময় অক্ষরবৃত্তে লিখতে পছন্দ করেন, আবুল হোসেন তেমন নন। তিনি মাত্রাবৃত্তে লেখেন, স্বরবৃত্তে লেখেন, তাঁর নিজের মতো করে অক্ষরবৃত্তে তো লেখেনই, কখনো-কখনো এমন কবিতা লেখেন, যা একইসঙ্গে মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত দুটোতেই পড়া যায়।' (মওলা, ২০১০ : ৫৩)

নিজের লেখার পাশাপাশি আবুল হোসেন অসংখ্য দেশি-বিদেশি কবিতা পাঠ করেছেন। পাঠসূত্রে অনুবাদ করেছেন অনেক বিদেশি কবিতাও। উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস (১৮৬৫-১৯৩৯), রবার্ট ফ্রস্ট (১৮৭৪-১৯৬৩), মুহম্মদ ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮), এজরা পাউন্ড (১৮৮৫-১৯৭২), টি এস এলিয়ট (১৮৮৮-১৯৬৫), ল্যাংসটন হিউজ (১৯০২-৬৭), জন ব্যারিম্যান (১৯১৪-৭২) ও রসুল গামজাতভসহ (১৯২৩-২০০৩) আরো অনেকের কবিতা। বিশ্বকাব্যভাষার চেহারাকে তিনি বাংলা কবিতার ভূগোলে সংযুক্ত করতে চেয়েছেন। অজস্র কবিতাপাঠের ভিড়ে বিশেষভাবে দুজনের প্রেরণা আবুল হোসেনকে বাংলা কবিতায় নতুন বোধে উদ্বুদ্ধ করেছে। তাঁদের একজন আমেরিকান কবি রবার্ট ফ্রস্ট, আরেকজন ডাবলিনের কবি ডব্লিউ বি ইয়েটস। ফ্রস্ট কবিতা সম্পর্কে একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন, কবিতা হচ্ছে মানুষের অভিজ্ঞতার নির্যাস। এবং কবিতার মধ্যে কবি প্রাজ্ঞতা খুঁজে পান। অভিজ্ঞতা এবং তা থেকে প্রাজ্ঞতা অর্জন আবুল হোসেনকে শিখিয়েছে — কবিতাকে কত সহজ করা যায়, কবিতাকে কত সহজ ভাষায় লেখা যায়। কত কম কথা বলে কত গভীরতা আনা যায়। বয়স বাড়ার সঙ্গে ইয়েটসের জীবনে অর্জিত হয় নানা বর্ণের অভিজ্ঞতা এবং অভিজ্ঞতাগুলোকে বিচিত্র দৃষ্টিকোণ থেকে ইয়েটস তাঁর কবিতায় রূপ দিয়েছেন। একই ব্যাপার ঘটেছে আবুল হোসেনের কবিতায়। জীবনের নানা টানাপড়েন ও বিয়োগব্যথা এই কবির অভিজ্ঞতায় সঞ্চার করেছে বহু রঙের মাত্রা। কবি জীবনের এই রঙগুলোকে কবিতার পঙ্‌ক্তি করে তুলেছেন।

নবীন বয়সে যেমন কবিতার প্রতি সুতীব্র আকর্ষণে মুগ্ধ ছিলেন, অন্তিমকালেও সমধিক কবিতাপ্রেম আবুল হোসেনকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। কবিতা লিখে মানুষের ভালোবাসা পেয়েছেন। ভালোবাসাই কবির লেখালেখির শক্তি। কবি সেই শক্তিতে অবলম্বন করে

আমরণ সৃষ্টিপ্রয়াসী হয়েছেন। অনেকেই কবিতায় চিন্তার আড়াল তৈরি করতে গিয়ে অস্পষ্ট রসহ্যময়তায় ডুবে যান। এই ডুবে যাওয়ার অভ্যাসে কবিতায় সৃষ্টি হয় দুই ধরনের ছলনা — তার একটির নাম চমক ও আরেকটি গিমিক। এর কোনোটিতেই কোনো বয়সে আবুল হোসেন ছিলেন না। তিনি তরুণ বয়সে যেমন ছলনামুক্ত কবিতা উপহার দিয়ে বাংলাদেশের কবিতায় আধুনিকতার বিকাশ ঘটাতে সতৃষ্ণ ছিলেন, ৯২-এর কোঠা পার করে সেই চেষ্টারই নানামাত্রিক দ্যুতি ছড়িয়ে গেছেন আমৃত্যু, বাংলা কবিতায় এমনটি বিরল।

২

কৈশোরের অনাবিল আনন্দের আত্মপ্রকাশ *নববসন্ত*। পুরাতনী ভাব ও বহিরঙ্গের গতানুগতিক রীতিপদ্ধতিকে বর্জন করে প্রথম কাব্য-বসন্তেই তাঁকে সজ্জিত করতে হয়েছে জীবনের সমগ্রতা অর্জনে আসন্ন দিনগুলোর ইঙ্গিত। *নববসন্তের* প্রথম সংস্করণে তারুণ্যবাহিত অন্তর্তাগিদ থেকে রবীন্দ্রাবেশ কিছু মাত্রায় হলেও তাঁকে সম্মোহিত রেখেছিল। কোথাও কোথাও তার কিছু রেশ লক্ষ করা যাবে। উৎসর্গপাতায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধানিবেদনের ভেতর তা দারুণভাবে প্রকাশ পেয়েছে — 'জানিয়াছি সুন্দরের তীর্থপথে তাহারে আমার/পরম পাথেয় বলে, তাহারেই শ্রেষ্ঠ পাওয়া মানি।' (আবুল, ১৯৪০, উৎসর্গপত্র : ৯) আবার নিজ প্রতিভাশক্তির তাড়নায় অব্যবহিত পরেই রবিমোহ থেকে ধীরে ধীরে সরে পড়লেন। তার পরিচয় আমরা *নববসন্তের* পরবর্তী সংস্করণে 'স্বপ্ন' থেকে 'দিক নির্ণয়' পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করেছি। *নববসন্তের* দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯৭৭) পূর্ববর্তী সংস্করণের ব্যাপক পরিবর্তন ও অতিরিক্ত কিছু কবিতা সংযোজনের মধ্য দিয়ে তাঁর স্বকীয়তা ও স্বকণ্ঠ নির্মাণের আভাস সূচিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণটি তিনি উৎসর্গ করেছেন আরেক রবিবিশেষজ্ঞ আবু সয়ীদ আইয়ুবকে (১৯০৬-৮২)। প্রথম সংস্করণে 'নবযুগ' থেকে 'ঘোড়সওয়ার' পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় সংস্করণে 'স্বপ্ন' থেকে 'দিক নির্ণয়' পর্যন্ত কবিতা রয়েছে। একই শিরোনামের কাব্যগ্রন্থ হওয়া সত্ত্বেও দুটি সংস্করণে কবির বিষয় ও আঙ্গিকচিন্তা সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাই পরবর্তী সংস্করণ না-করে *বসন্ত-উত্তর* শিরোনামে স্বতন্ত্র একটি কবিতার বই বের করলে তাঁর ক্রমচেতনাবিবর্তন চেনা যেত সহজেই। 'দিক নির্ণয়' কবিতায় কবি তাঁর সময় ও পরিবেশ সম্পর্কে একেবারে নতুন কথা বললেন, 'বাতাস বিরূপ সময় বৈরী'। এই উচ্চারণে এলিয়টের 'জার্নি অব দি ম্যাজাই' কবিতার একটা লাইনের অনুরণন স্পষ্ট। তেমনি ফ্রস্ট এসেছেন নিম্নোক্ত চারটি লাইনে : 'পথটা সোজা না বাঁয়ে না ডাইনে/জানি না জানি না জানতে চাইনে। শুধু জানি এই সেটা নিজেকেই/নিতে হবে চিনে যথাসময়েই।' (আবু রুশদ, ১৯৯৭ : ৭) তবে ভিনদেশি কবিতার ঋণ নিলেও পুরো কবিতার শরীরে নিজস্বতার পরিচয় রেখে গেছেন আবুল হোসেন; বিশদে এর মূল্যায়ন আমরা পরের অনুচ্ছেদে উপস্থিত করব।

নববসন্ত প্রকাশিত হয় ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। ছাপা হয়েছিল কলকাতায়, ৩২ নং আপার সার্কুলার রোডের বিখ্যাত শ্রীসরস্বতী প্রেস থেকে। বনেদি এন্টিক কাগজে। সে কাগজের মান এত ভালো যে অর্ধশতাব্দী পরেও তার সাদা রঙ এখনো সাদাই আছে, পাতাগুলো একটুও নরম হয়নি। লেখকের চামড়া ইতোমধ্যে ঢিলেঢালা হয়ে চুলে পাক

ধরলেও তাঁর প্রথম বইটির সে-নব যৌবন আজো অটুট। যাঁদের কাছে ১৯৪০ সালের এই বইটি আছে তাঁরা সাক্ষী। (আবুল, ১৯৯৩ : ১৩) কবি নিজেই স্বীকার করেছেন, তাঁর চিন্তাচেতনায় গভীরভাবে প্রভাব ফেলেছেন আবু সয়ীদ আইয়ুব। আইয়ুবের সাহিত্যিক ও দার্শনিক গভীরতা তাঁকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। তাঁর মাধ্যমেই বুদ্ধদেব বসুসহ (১৯০৮-৭৪) অনেক মেধাবী কবি-সাহিত্যিক ও গুণীজনের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ হয়। এ ছাড়া তাঁর সাহিত্যজীবনের শুরুতে বন্ধু গোলাম কুদ্দুস, *নববসন্তের* প্রকাশক হবিবুল্লাহ বাহার চৌধুরী, শান্তিনিকেতনের শিল্পী রামকিংকর বেইজ (১৯০৬-৮০), ছাত্র রথীন্দ্রনাথ ঘটক চৌধুরী (জ. ১৯২১), জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪), সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-৬০) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। এঁদের উৎসাহ, সাহচর্য, সহযোগিতা পারস্পরিক ভাববিনিময় তখনকার সময়ের আলোচ্য তরুণ কবিকে কবিতাবোধে অনাবিল আনন্দ দিয়েছে এবং আধুনিক কবিতার দিকে সাদরে আমন্ত্রণ করেছে। মুদ্রণপ্রযুক্তির অনগ্রসরতা সত্ত্বেও চল্লিশের দশকে কী করে একজন তরুণ তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত, মুদ্রণ ও প্রকাশের সুযোগ পেয়েছিলেন তা কবির নিম্নের স্মৃতিচারণ থেকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি —

> বইটা প্রকাশের ব্যাপারে ভাগ্যের প্রসন্নতা কখনো ভুলব না। প্রথম বই ছাপতে গিয়ে তরুণ লেখককে যে বাধার দরজায় মাথা খুঁড়তে হয়, সেই দুর্যোগ আমাকে পোহাতে হয়নি। আমাকে প্রকাশক খুঁজতে হয়নি, না চাইতেই আমি এক সুহৃদ পেয়েছিলাম। বই ছাপার প্রস্তাব তাঁর কাছ থেকেই এসেছিল। তার আগে এটা আমার মনেও হয়নি। দুদ্দাড় দুহাতে লিখে যাচ্ছি। ভালোমন্দ ভাববার সময় নেই। তবে কিছু কিছু লেখা কারো কারো চোখে পড়ে থাকবে। দু চারজন পিঠ চাপড়ে দিচ্ছিলেন। আমার প্রকাশক এখন তাঁর নাম করি, হবিবুল্লাহ বাহার, সাধারণ ব্যবসায়িক অর্থে প্রকাশক ছিলেন না। তিনি নিজেদের বই, মানে তাঁর এবং তাঁর বোন শামসুন নাহারের লেখা বই, প্রকাশ করতেন। যদ্দুর মনে পড়ে *নববসন্ত* প্রকাশের আগে তিনি শুধু আর দুজন বাইরের লেখকের বই বের করেছিলেন। মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলি ও আবু রুশদের। ওয়াজেদ আলি ছিলেন প্রতিষ্ঠিত লেখক। আবু রুশদ আমারই মতো আনকোরা। ওয়াজেদ আলির সম্ভবত অন্য প্রকাশকও ছিল। কিন্তু আমাদের বই বাহার সাহেবের মতো শৌখিন প্রকাশক না জুটলে সেই সময় অবশ্যই বেরুতো না। ছোট শহর থেকে কলকাতায় কলেজে পড়তে এসেছি। নিজের কোনো আয় নেই, সামান্য বৃত্তি ছাড়া। বাবার কাছে বই ছাপবার টাকা পাব, ভাবাই যায় না। বাহার সাহেব যখন কথাটা পাড়লেন একদিন সকালে অনেকক্ষণ আমার মুখ দিয়ে কথা বেরোয়নি। বিশ্বাস হচ্ছিল না। আমার অবস্থা দেখে তিনি বললেন, চা খান। তাঁর ৬ নং গোরা চাঁদ লেনের বাসায় আড্ডা দিতে চা নাশতা খেতে আমি এবং মওলানা মুস্তাফিজুর রহমান হামেশাই যেতাম। এই মওলানা ছিলেন সেকালে মুসলমানদের পত্রপত্রিকার নিয়মিত লেখক। শেরোয়ানি এবং টুপিতে তাঁকে যত না ভারিক্কি মনে হত তার চেয়ে জ্ঞানের সঙ্গে সৌন্দর্যপ্রীতি, রসবোধ এবং বিনয় মিশে তাঁকে করেছিল আকর্ষণীয়। তিনি খুশি হতেন আমাদের সঙ্গে গল্পগুজব করে, স্বস্তি পেতেন আমাদের সাহচর্যে। এ রকম আধুনিক মওলানা খুব কমই দেখেছি। সেই সকালের আড্ডায় মওলানাও ছিলেন। বাহার সাহেবের প্রস্তাবটা শুনে বললেন, মারহাবা। তারপরেই আমার পিঠ চাপড়ে মার দেয়। তখনো মওলানার কোনো বই বেরোয়নি, যদিও তিনি আমার চেয়ে বয়সে বড় এবং লিখেছেনও বেশি। যেখান থেকে বইটা বেরিয়েছিল তার পোশাকি নাম বুলবুল হাউস। ঠিকানা ৩২ নং ক্রিমেটেরিয়ম স্ট্রিট, কলকাতা। সেটা আবাসিক বাড়ি, কোনো ব্যবসার স্থান নয়,

অফিসটফিসও নয়। বুলবুল হাউসের কোনো সাইনবোর্ড ছিল না। প্রকাশক হিসেবে নাম ছাপা হয়েছিল : আনোয়ারা চৌধুরী। বাহার সাহেবের স্ত্রী। হবিবুল্লাহ বাহার ছিলেন যেমন শৌখিন তেমনি দরাজদিল। ব্যয় করতেন আয়ের হিসেব না করে। তাঁর আয়ের একটা নিয়মিত উৎস নির্দিষ্ট অবশ্যই ছিল। কিন্তু সেটা কোথায় তা খুব কম লোকই জানত। আসলে টাকা-পয়সা হিসেব-কেতাবের মতো এইসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে কেউ তাঁকে মাথা ঘামাতে দেখেনি। তাঁকে কখনো বিমর্ষও পাইনি। একটা অবিমিশ্র খুশির, ফুর্তির হাওয়া তাঁকে সব সময় ঘিরে থাকত। আমার মতো নবীন লেখকের বই তিনি প্রকাশ করতে গেলেন কেন? তাঁর তো কোনো প্রত্যাশ্যা ছিল না। বইটা বিক্রি হবে অথবা যে টাকা খরচ হল তা উঠে আসবে। নিশ্চয় ভাবেননি হয়তো আমাকে স্নেহ করতেন বলে। হয়তো এই নতুন লেখকের লেখা তাঁর ভালো লেগে থাকবে তাঁকে উৎসাহ দিতে চেয়েছিলেন, হয়তো তাঁর একটা দরকারি কাজ করে দিয়েছিলাম বলে। আমার কাছে সেই কাজটা তেমন কঠিন মনে হয়নি, খানিকটা কৌতূহল ও কৌতুক নিয়ে এক মাসে তাঁকে চারটা ছোটদের পাঠ্যপুস্তক লিখে দিয়েছিলাম, প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণির জন্য। সেগুলো তাঁর খুব কাজে এসেছিল। কপাল গুণে বইগুলো টেকস্ট বুক বোর্ডের অনুমোদন পেয়ে গেল। তার পরিবর্তে বাহার সাহেব আমাকে দুশ টাকা দিয়েছিলেন। তার উপর এই কবিতার বই প্রকাশ। এমন সহৃদয়তা দুর্লভ। তখন বই ছাপার কথা তো স্বপ্নেও ভাবিনি। বাহার সাহেব যখন প্রস্তাবটা দিলেন তখন তাড়াহুড়ো করে একটা পাণ্ডুলিপি তৈরি করতে বসে গেলাম। নবীন লেখকরা পাণ্ডুলিপি বগলে নিয়ে দরজায় দরজায় ঘুরে মরে। আমি আকস্মিকভাবে পেয়ে গেছি বলে ভয় ছিল দেরি হচ্ছে বলে যদি প্রস্তাবটা হাতছাড়া হয়ে যায়, বাহার সাহেবের উৎসাহে ভাটা পড়ে। দিনের পর দিন প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতাগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করি। কোনটা ছেড়ে কোনটা নেব, ঠিক করা হয় না। সে সময় আমার সবচেয়ে কাছাকাছি ছিল গোলাম কুদ্দুস। সে কিছু কবিতা বাছাই করল, কিছু বাহার সাহেব। শান্তিনিকেতনের এক তরুণ ছাত্র রথীন্দ্রনাথ ঘটক চৌধুরীও এসে জুটল। বাকিটা আমার। আমাদের সকলের রুচি তো একই রকম ছিল না। মন-মেজাজও বেশ কিছুটা ভিন্ন। ফলে যে পাণ্ডুলিপিটা তৈরি হল তার কবিতাগুলো কোনো এক সূত্রে বাঁধা পড়ল না। মনটা খুঁতখুঁত করছিল। আমার পণ ছিল রবীন্দ্রনাথ বর্জন। তাঁর ছাপ যেন কোথাও না থাকে। সেই বয়সেই ঠিক করে নিয়েছিলাম আমাকে ভিন্নপথ ধরতে হবে, সেটা হল না। তাঁকে একেবারে ছাঁটাই করতে গেলে বই হয় না। আরো কতদিন বসে থাকতে হবে আল্লাহ মালুম। এতদিন বাহার সাহেব কি বসে থাকবেন। হাতের পাখিটা বনের পাখির চেয়ে দামি। রবীন্দ্রনাথকে তাঁর সময়ে এড়িয়ে বা পাশ কাটিয়ে যাওয়া কী কঠিন ব্যাপার ছিল তার সাক্ষী দেবে তিরিশের প্রধান কবিদের প্রথম লেখাগুলো। *নববসন্তেই* শুরু, তবে নিজের কথা নিজের মতো করে বলতে আমার আরো কিছু সময় লেগেছিল। বইটা ছাপতে মোটেও সময় লাগেনি। দু একটা ছোটখাটো বাধা ছাড়া বলতে গেলে কোনো রকম ঝামেলাই হল না। তরতর করে নদীর স্রোতের মতো ফর্মাগুলো বেরিয়ে এল। শ্রীসরস্বতী প্রেসের প্রুফ রিডাররা এমন পাকা ছিল যে আমার প্রুফ দেখার দরকার হয়নি। তবু আমার দুর্ভাবনা সয় না দেখে বাহার সাহেব ছাপার আগে একবার চোখ বুলিয়ে নিতে বলেছিলেন। অথচ বইটা যখন বের হল, নিখুঁত হয়েই এল। ছিদ্রান্বেষী কুদ্দুস দু একটা চন্দ্রবিন্দুর বাড়াবাড়ি আবিষ্কার করে। অথচ পাণ্ডুলিপিতে সব বানানই শুদ্ধ ছিল, এ কথা বড় মুখ করে বলার আমার সাহস নেই। প্রেসের যিনি মালিক ছিলেন তাঁর নাম আমার আর মনে নেই। মুদ্রাকরের নাম দেখেছি শৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায়। তাঁর চেহারা চালচলন এখনো চোখে ভাসে। ধবধবে ধুতি পাঞ্জাবি পরা, চোখে মোটা কাচের চশমা, গায়ের রঙ কাঁচা হলুদ, গোলগাল ভারিক্কি এই মানুষটি ছিল প্রেসের প্রাণ। প্রেসের মালিককে

> সারাক্ষণ গ্যাট হয়ে বসে থাকতে দেখেছি। কিন্তু শৈলেন বাবুই ছিলেন সর্বেসর্বা। তাঁদের ছাপা বইতে যদি ভুল থাকে তাহলে শুধু প্রেসেরই নয়, তাঁরই মাথা কাটা যাবে। তিনি নিজের হাতে বানান শুদ্ধ করে ছিলেন। এমনকি দু একটা কবিতার লাইনের চেহারা তাঁর মনে ধরেনি। কিন্তু আমার সম্মতি না পাওয়ায় আর এগোননি। হায়রে, এইসব প্রেসওয়ালারা কোথায় গেল? (আবুল, ১৯৯৩ : ১৩)

তাঁর আপাতসরল কবিতায় কত কারুকাজ যে লুকিয়ে থাকে তা তিনি কখনো ভাববার সুযোগ দেন না। এই হালকা রঙ আর সূক্ষ্ম বিরল রেখার কবি নিজের জন্য এমন এক জগৎ গড়ে নিয়েছেন যা আমাদের চড়া রঙ আর তীব্র তীক্ষ্ণ উত্তেজনা ও উদ্বেগভরা কবিতার পৃথিবী থেকে একেবারেই আলাদা। (আবুল, ১৯৮৫ : শেষ প্রচ্ছদ) পূর্বসূরি অনেকের কবিতার আবেগ ও ভাবালুতা প্রসঙ্গে কবি নিজেই এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন —

> আবেগ হচ্ছে কবিতার প্রথম উপকরণ। হৃদয়ে আবেগের তোড় না থাকলে কখনো কবিতা হয় না। কিন্তু সেই আবেগ যাতে কবিকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে না পারে সে সম্পর্কে সব সময় সাবধান থাকতে হয়। সেখানেই তাঁর শিল্পকর্ম। আমি স্বতঃস্ফূর্তভাবে কবিতা লিখি না। কথাটা আসলে হবে শুধু প্রেরণার বশে কবিতা লিখি না, কেননা কবির কাছে কবিতা আসে প্রেরণা হিসেবে। সেই প্রেরণাকে সংস্কৃত করতে হয়। যেমন একজন ভাস্কর তার শিল্পকার্য করেন হাতুড়ি বাটালি দিয়ে পাথর কুঁদে কুঁদে। কবিকেও তেমনি কঠোর পরিশ্রমে শব্দকে কুঁদে কুঁদে কবিতা তৈরি করতে হয়। আমি যে কবিতায় আবেগের বাহুল্য বর্জন করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে এসেছি সারা জীবন তা এ জন্যে যে কবিতা লিখতে শুরু করার কিছুদিন পরেই আমার মনে হয়েছিল বাংলা কবিতা খুবই ভাবালুতাপূর্ণ, তার শরীরে যেন হাড় নেই, পেশিও নেই। এই ভাবালুতা বর্জনকে অনেকে ভুল করে বলেছেন আবেগবর্জন। আমি সেন্টিমেন্টের বিরোধী নই, সেন্টিমেন্টালিটির বিরোধী। তাকে সত্যিই ভীষণ ভয় পাই। (মারুফ, ১৯৯৩ : ১১)

আবুল হোসেন উন্মেষপর্বে অরণি পত্রিকাতে 'সন্ধিহীন' শিরোনামের একটি কবিতা লিখেছেন যেটিতে তাঁর আধুনিক চেতনা আভাসিত। তখন তিনি হয়ে পড়ছিলেন কিছুটা বামঘেঁষা। এ সময় তিনি অ্যান্টিফ্যাসিস্ট রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কাজেই এ লেখায় তিনি পুরোপুরি নিরপেক্ষ হতে পারেননি। সেই দিক থেকে 'দিক নির্ণয়' তাঁর শিল্পচেতনার উৎসস্তর বলা যেতে পারে। এটি তাঁর শিল্পান্বেষী মনের বীজকবিতাও। এই কবিতা থেকে আমরা শেষপর্যন্ত তাঁকে শিল্পের অনন্ত পথের অভিযাত্রীরূপে দেখতে পাব। কোথাও তিনি পথ খুঁজছেন, কোথাও দেখছেন পথের শেষ নেই — নানা দিকে প্রশাখা ছড়িয়ে গেছে এর, কোথাও এই পথ জনাকীর্ণ, কোথাও জনশূন্য, কোথাও এই পথ তাঁর কাছে মনে হয়েছে বৈরী সময়ের রূপক। তবে তিনি কোন পথের সন্ধানে নিজেকে সমর্পিত করেছেন? — প্রশ্ন করে নিজের সত্তার কাছে অবগত হতে চেয়েছেন। কবিতার পথ হবে শেষপর্যন্ত শিল্পের পথ, কবিকে তা সর্বহৃদয় দিয়ে স্বায়ত্ত করতে হয়। হৃদয়গ্রাহী সৎ কবিতা সৃষ্টির জন্য একদা রিলকে (১৮৭৫-১৯২৬) তাঁর শিল্পীসত্তার সমীপে জিজ্ঞাসা রেখে এর মীমাংসা খুঁজেছিলেন : 'go into yourself find out reason that commands you to write; see whether it has spread its root into very depths of your heart.' (Rainer, 1984 : 7) রিলকে সম্ভবত আমাদের বলতে চেয়েছেন, অন্তরঙ্গ সৎ কবিতার জন্য মনের গভীর প্রদেশে অনুসন্ধান চালাতে হবে, এক সময় কবিতা লেখার

উপকরণ-উৎস বেরিয়ে আসবে। আবুল হোসেন সেই শিল্পীমন নিয়েই অন্তঃপৃথিবীর গভীর প্রদেশে ঢুকতে চেয়েছেন বারবার। পিতা-পিতামহ যে পথে গেছেন তা যতই মূল্যবান হোক, কিংবা পথিকের মূল্যবান পথচলা যতই স্বাভাবিক হোক, অথবা যে-পথে তাঁর মতো আরো কেউ কেউ চলেছেন — সে পথেও নয়; তিনি স্থির করেছেন এমন পথে যাবেন যে পথে 'দুপুরে নামে ঘনরাত' (আবুল, ১৯৪০ : ৫৮) যে-পথ অসম্ভবের দিকে পা বাড়ায়, যে-পথ অসম্ভবকে সম্ভব করতে প্রয়াসী হয় বারবার, যে-পথের চালিকাশক্তি শিল্প নামের এক রহস্যময় কুহক, যার কোনো স্থবিরতা নেই, স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার সময় নেই তার, সে এগুতে থাকে অবিরাম-অনন্ত কুহকের দিকে। কবির উক্তিও শিল্পপথের এই কুহকের দিকে :

> শুধু জানি এই সেটা নিজেকেই
> নিতে হবে চিনে যথা সময়েই।
> ('দিক নির্ণয়', *নববসন্ত;* আবুল, ১৯৭৭ : ৫৮)

'বুদ্ধিমান ও হৃদয়বান হওয়াটাই যথেষ্ট নয়, তাঁকে হয়ে উঠতে হবে তাঁর নিজের আর পরিপার্শ্বের অস্তিত্ব বিষয়ে প্রশ্নময়। নিজেরও মনের মধ্যে একটি অব্যক্ত আর্তনাদ যদি কারো থাকে, প্রত্যেক দিনের ছককাটা যাপনের বাইরেও কোনো ব্যথা যদি ব্যাকুল করে কাউকে, নিজের চারপাশের সঙ্গে একটি সম্পর্কসূত্র তবে বুঝে নিতে চান তিনি।' (শঙ্খ, ১৯৯৬ : ৫১) আবুল হোসেনও অস্তিত্ব প্রশ্নে সচেতন। তাঁর অন্বিষ্ট চিরায়ত চেতনার গভীরে। বিষাদকাতর হয়েছেন বারবার, দেখেছেন ক্লেদাক্ত জীবনের নির্মম পরিণতি। সমাজের মানুষের অসহায়তা তাঁকে ক্লিষ্ট করেছে, তবু তাঁর কবিতার অন্তঃপৃথিবী সময় ও সমাজের সংকটকালকে অতিক্রম করে আলোকিত জীবনের দিকে প্রসারিত হয়েছে। তাই স্বাভাবিকভাবে অস্তিত্বকামী জীবনের সপক্ষে তিনি তাঁর শৈল্পিক সত্তাকে অখণ্ডভাবে যুক্ত করতে প্রয়াসী হয়েছেন কবিতায়। আপাতদৃষ্টিতে মুরের (১৪৭৮-১৫৩৫) আর্কেডিয়ার মতো স্বপ্নরাজ্যের প্রতিশ্রুতি তাঁর কোনো-কোনো কবিতায় প্রভাব সঞ্চার করলেও তা ইউটোপিয়া-ভারাক্রান্ত হয়নি। শিল্পীসত্তায় তিনি স্বপ্নময় পৃথিবীর আবেদন রাখলেও প্রকৃতপক্ষে শত দুর্মর পরিস্থিতিতেও মানুষকে অস্তিত্ববাদী হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি প্রাচীন মিশরের পিরামিড প্রতীকের মাধ্যমে বর্তমান মানব-অস্তিত্বের এক প্রতিচিত্র উপস্থাপন করেন। পিরামিডগুলো চিরনিদ্রায় পড়ে থাকে, থাকবে চিরকাল। কবির প্রত্যাশা আমাদের মানুষগুলো ঘুমকাতর হবে না পিরামিডের মতো। তাঁরা স্বপ্ন দেখবে, তাঁদের রক্তে জাগবে জেগে উঠবার দুর্বার প্লাবন — এইভাবে কবি অনেক কবিতায় সংকট দূরীভূত করে মানুষকে অস্তিত্ববান হওয়ার জন্য স্বপ্নময় জগতে আহ্বান জানান —

> ঘুম ঘুম ঘুম
> ঘুমায়েছে ব্যাবিলন, পিরামিডগুলি,
> প্রাচীন মিশর
> সহস্র মোয়েনজোদাড়ো
> সুলেমান, রিচার্ড, ক্রুসেড
> জেরুজালেম
> ঘুম ঘুম ঘুম

তবু তো আজ স্বপ্ন দেখি
তবু তো হৃদয় করে আজও টনটন
তবু তো শোণিতে জাগে আজও দুর্বার প্লাবন
তবুও তবুও।
('তবু', *নববসন্ত;* আবুল, ১৯৭৭ : ৩৩)

তাঁর কবিতায় কখনো স্বপ্ন ব্যহৃত হয়েছে বিপন্নতা ঘুচিয়ে জীবনকে নতুন করে পাওয়ার প্রতীকরূপে, কখনো স্বপ্নের প্রতীক বা রূপক এসেছে ঔপনিবেশিকতা মোচনের শৈল্পিক উপকরণ হয়ে। ঔপনিবেশিক শক্তি ও বিজ্ঞানের কুফল সমাজ জীবনের ভারসাম্যকে করেছে শতচ্ছিন্ন। যদিও 'ঔপনিবেশিক শাসনের বিপন্ন পটভূমিতে মূষিকরূপী বর্বরদের পদচারণা তাঁর স্বপ্ন ও সৌন্দর্যকল্পনাকে করে তোলে ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত।' (রফিকউল্লাহ, ১৩৯০ : ৯) তবু তিনি অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্নে সর্বদাই স্বপ্নবান থেকেছেন, বলেছেন আশাবাদিতার কথা—

ওদের কামানগুলো যদি পারত
উড়িয়ে নিতে সব বালুকণা
মরুভূমির অসংখ্য অগণ্য বালুরাশি,
ওদের বোমাগুলি যদি পারত মরুভূমির মাটি ফাটিয়ে
জলের উৎসধারা বের করতে,
ওদের ট্যাঙ্কগুলো যদি চষে ফেলত সমস্ত মরুভূমি,
বেয়োনেটের আগায় মাটি খুঁড়ে বুনতে পারত ধান
যদি পারত পারত পারত।
('ঘোড়সওয়ার', *নববসন্ত;* আবুল, ১৯৪০ : ২৯)

আবুল হোসেন সুন্দরের প্রতি পক্ষপাতপূর্ণ একটি পৃথিবী সব সময় চেয়েছেন। সমাজকেও সেভাবে দেখতে চেয়েছেন। যাঁরা সুন্দর সমাজ গড়ার শক্তি রাখেন, সৃষ্টিশীলতা দিয়ে শৈল্পিক জীবন বিস্তারের সামর্থ্য রাখেন তাঁদের চলে যাওয়া নিয়ে কবির আক্ষেপ তৈরি হয়। সুন্দর সমাজ ও জীবন গড়তে পারেন যাঁরা আরো অনেক দিন বেঁচে থাকুন তাঁরা, তবেই মানবজীবন হবে গ্লানিহীন অর্থময়, কবি এভাবে দেখেন মানবসংসারকে :

এই পৃথিবীটা যদি আর একটু কম দুঃসহ হত,
সময় না হতেই যাদের চলে যেতে হল
তাদের অনেকেই বেঁচে থাকত,
বাসা বাঁধত, লিখত, ছবি আঁকত, গান করত,
জীবনের একটা মানে খুঁজে পেত।
(*এখনও সময় আছে:* আবুল, ১৯৯৭ : ৫৯)

নগর-অনুষঙ্গ তাঁর কবিতায় বিশেষ মাত্রা পেয়েছে। বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তির অগ্রগতি নগরজীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। এই প্রভাবে নগরজীবন ও নগরসংলগ্ন প্রতিবেশ হয়ে পড়েছে যন্ত্রসর্বস্ব। তাই সমকালসংলগ্ন নগরপ্রতিবেশ লালিত তাঁর শিল্পচৈতন্য নাগরিক জীবনের যন্ত্রনির্ভর সভ্যতাকে অনায়াসে রূপায়িত করেছে তাঁর কাব্যে। ট্রাম-বাস-মোটর,

ডাইনামো, এল এম জি, স্টেনগান, গ্রেনেড, থ্রি নট থ্রি, বেয়োনেট, সদর রাস্তা, রেস্তোরাঁ, কাঁটাতার, দেয়াল, পোড়া চামড়া, মিছিল, ফুসফুসে সীলমোহর, ভিজে কাক, লোহা, ইট, পাথর, থ্যাতলানো থাম, চৌরাস্তা, অলিগলি ইত্যাদি নানা উপকরণ তাঁর কবিতায় ছড়িয়ে আছে।

আবুল হোসেনের কবিতা পড়লে কখনো মনে হয় না তিনি ছন্দশাসনে তাঁর সংবেদনাকে ধরে রেখেছেন। আবার ছন্দনিরীক্ষাও তিনি একেবারে কম করেছেন, এমন নয়। কোথায় কত মাত্রা দিতে হবে, জোড় কি বিজোড়, মুক্তক কি অন্তর্গত গদ্যছন্দ, নাকি প্রচলিত ছন্দে ভাবনারাশিকে কবিতায় গাঁথতে হবে — তা তিনি অত্যন্ত দক্ষতা ও সতর্কতায় প্রয়োগ করে গেছেন। ফলে ছন্দকাঠামোর পরিমাপটি মুখ্য হতে পারে তাঁর কবিতায়, বরং সচরাচর বোধের সহজাত স্পন্দনটিই উঠে এসেছে। অনেক কবিতায় তিনি বিষয়ানুগ ছন্দবৈচিত্র্যের কাজ করেছেন। স্বরবৃত্ত ছন্দ, কিছু মাত্রাবৃত্ত, এবং ধীর লয়ের জন্য অক্ষরবৃত্তের নানা রকম চালের মধ্য দিয়ে গদ্যছন্দের দ্বারস্থ হয়েছেন কবি। আবার কখনো দেখা গেছে গদ্য ও পদ্যের বিভেদ ভেঙে এক নতুন রূপ বিচার করেছেন। প্রথাগত ছন্দের বৃত্তে বৃত্তাবদ্ধ না হয়ে প্রতিটি প্রথানুগ ছন্দকে তাঁর পরীক্ষাশীল মনন চৈতন্য দ্বারা ভেঙেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, অক্ষরবৃত্ত বা পয়ারের ৮।৬ পর্বের ৮ মাত্রার বিজোড়-বিজোড়-জোড় (৩, ৩, ২) করেছেন। আবার একই কবিতায় প্রথাগত তিন ছন্দের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন — যা মুক্তক ছন্দ নামে পরিচিত। কোথাও সমিল গদ্য প্রয়োগ করেছেন, কোথাও কোথাও অলংকার ব্যবহারের খানিক আভাস থাকলেও বিশেষ কবিধর্মের প্রেরণায় ধ্বনিনির্ভরতার পথ বহুলাংশে পরিহার করেছেন। উপলব্ধিকে তিনি আবেগের কাছ থেকে যতটা দূরে সরিয়েছেন ততটাই চিন্তাকে কাছে টেনেছেন, ফলে তাঁর কবিতায় সঞ্চারিত হয়েছে বিরল সুন্দর বেশ কিছু চিত্রকল্প। শেষ অনুচ্ছেদে তার কিছু পরিচয় আমরা লিপিবদ্ধ করার প্রয়াস পাব।

৩

মনে ধরলে এক মানুষ আরেক মানুষের আদর্শ হতে চান। বাস্তবে হয়েও যান। কবির ক্ষেত্রে এটা বড় ব্যতিক্রম। কবি কারো আদর্শ হতে চান না। নিজের পরিচয়ে বেড়ে উঠতে চান। দেখা পৃথিবীর বাইরে কবির একটি আপন পৃথিবী থাকে। কবি এই আপন পৃথিবীরই আদর্শ হতে চান, অন্য কারো নন। কবিরা স্বয়ম্ভর, কোনো কেনো ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় নির্জন, একাকী। সামান্য অপ্রস্তুত করে দিলেও একটি সত্য এমন — এক কবির জমিনে আরেক কবির জায়গা হওয়া অসম্ভব বলে বিবেচিত হয়। এক কবি আরেক কবিকে নিজ জমিনে স্থান দিতে অপারগ হয়ে পড়েন। যেমন, একদা পারেননি রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দকেও। সামাজিকভাবে পারলেও সৃষ্টিশীলতার বিচারে মানসিকভাবে পারেননি। এখন থেকে ৭৮ বছর আগে রবীন্দ্রনাথকে দেওয়া জীবনানন্দের *ধূসর পাণ্ডুলিপি* সম্পর্কে মন্তব্য তাঁর বড় সাক্ষ্য। *ধূসর পাণ্ডুলিপি* বেরিয়েছিল ১৯৩৬ সালে। সে-সময় রবীন্দ্রবোধের কাছে *ধূসর পাণ্ডুলিপি* ঠেকেছে পাইন গাছের পাশে শান বাঁধানো ঘাটের মতো বেখাপ্পা। তবে প্রেরণাবোধক বাক্য সঞ্চার করতেও দ্বিধা ছিল না কবিগুরুর, 'তোমার লেখায় রস

আছে, স্বকীয়তা আছে এবং তাকিয়ে দেখার আনন্দ আছে।' (দেবীপ্রসাদ, ১৯৯৭ : ৯৬) এরও নয় বছর আগে ১৯২৭ সালে জীবনানন্দ তাঁর সদ্যপ্রকাশিত প্রথম বই *ঝরাপালক* পাঠিয়েছিলেন কবিগুরুকে। সেখানে লব্ধ কবিতার বই সম্পর্কে তাঁর বিচার জীবনানন্দের জন্য কিছুটা হোঁচট খাওয়ার মতো হয়েছিল বৈকি, 'তোমার কবিত্বশক্তি আছে তাতে সন্দেহমাত্র নেই। কিন্তু ভাষা প্রভৃতি নিয়ে এত জবরদস্তি কর কেন বুঝতে পরি নে। কাব্যের মুদ্রাদোষটা ওস্তাদীকে পরিহসিত করে। বড়ো জাতের রচনার মধ্যে একটা শান্তি আছে, যেখানে তার ব্যাঘাত দেখি সেখানে স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মে। জোর দেখানো যে জোরের প্রমাণ তা নয় বরঞ্চ উল্‌টো।' (দেবীপ্রসাদ, ১৯৯৭ : ১৯) কবিরা আপন কাব্যাদর্শের আলোতে নিজচিন্তার বিচ্ছুরণ ঘটান সারাটা জীবন। এজন্য আপন চিন্তাসীমার বাইরে গিয়ে আবির্ভূত নতুন সময়ের কবিকে বিচার করতে পারেন না। যতটা করেন তা নিজ কাব্যদর্শনের আলোকে। সাতাশি বছর আগে কবি যেমন করে পরের সময়ের নবীন কবিকে নিয়েছেন, সময়ের পরের কবিও তেমন করেই নেবেন এর পরের কবিকে।

ঝরাপালকের পর ১৩ বছরের মাথায় আত্মপ্রকাশ করে আবুল হোসেনের *নববসন্ত*। ঝরাপালক নিয়ে অনেক ভালোর ভেতর তির্যক মন্তব্য ছুড়েছিলেন জীবনানন্দের প্রতি রবীন্দ্রনাথ। এর ১৩ বছর পর কাজী নজরুলের (১৮৯৯-১৯৭৬) হাতে যখন আসে সদ্যপ্রকাশিত *নববসন্ত*, তখন কি নজরুল তাঁর আপন কাব্যসত্তার বাইরে গিয়ে আবুল হোসেনের নতুন কাব্যচিন্তার বিচার করতে পেরেছিলেন? কাজী নজরুলকে আবুল হোসেন তাঁর যৌবনে দেখেননি। তাঁর সঙ্গে যখন আলাপ হল, নজরুল চল্লিশে পা দিয়েছেন। আবুল হোসেন দেখলেন তারুণ্যের নির্মোক থেকে নজরুল তখনো বেরিয়ে আসেননি। জীবনাভিজ্ঞতায় পূর্ণ বিবর্তিত হয়েও তাঁর ভেতরের কিশোর কখনো বেড়ে ওঠেনি। *নববসন্ত* বেরুলে নবীন কবি নজরুলকে এক কপি উপহার দিয়েছিলেন। সপ্তাহখানেক পরে একদা গ্রামোফোন কোম্পানির রিহার্সেল রুমে হাজির হতেই নজরুল প্রায় চেঁচিয়ে উঠে নবীন কবির অভিমুখে প্রকাশ করলেন তাঁর অভিমত, 'একি করেছো হে, তোমার বয়সে এরকম কবিতা কেউ লেখে?' (আবুল, ২০১১ : ২৯৫) নবীন কবির নীরবতা দেখে আরো বললেন, 'কবিতা কি এত মেপেমেপে লেখে? কবিতায় চাই ফেনিল উচ্ছ্বাস, আবেগের উদ্দামতা। সে বুদ্ধির ধার ধারে না, বিচার-বিবেচনা করে না। জানো, আমি সাপ দেখে ভয় পাইনি, দুই হাতে চেপে ধরেছি তার ফণা। খেয়াল হয়নি তার বিষের কথা। আগুন দেখে দৌড়ে গেছি, জাপটে ধরেছি বুকে। মনে হয়নি হাত পুড়ে যাবে। আবার সাগর দিয়ে যখন আমাদের জাহাজ যাচ্ছিল আমি তার উত্তাল তরঙ্গমালা দেখে নিজেকে আর সামলাতে পারিনি, ঝাঁপ দিয়েছিলাম সেই ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ সমুদ্রে। সমস্ত শরীর দিয়ে সমুদ্রের স্বাদ নিতে চেয়েছি।'[২৭] *নববসন্ত* নিয়ে নজরুল নবীন কবিকে নিতান্তই অকপটে তাঁর যে অভিমত রাখলেন তাতে তাঁর কাব্যবোধের কোন মনোভঙ্গিটি পাওয়া গেল — নিরেট আত্মমত, প্রতিক্রিয়া, না আক্রমণ? সে-বিচার যেমন হোক; ইতিহাস থেকে জানা যায়, পূর্বসূরি কখনো উত্তরসূরির নতুন কাব্যবোধের যথাবিচার করতে পারেন না। হয়তো সেটা সম্ভবও নয়। নবীন কবির প্রথম বইয়ের অভিনব ভঙ্গি ও আঙ্গিকের ভেতর নজরুল নতুনত্বের স্বাদটি তখন অনুধাবন করতে পারেননি। এর বিপরীতে স্বল্পবাক নবীন কবি আবুল হোসেনের প্রতিক্রিয়া ছিল

নিতান্তই সংযত, 'এরপর কি কথা চলে? আমি তর্কে যাইনি, প্রশ্নও করিনি।' (আবুল, ২০১১ : ২৯৫)

কবির স্বয়ম্ভর সত্তা এজন্য দায়ী। আবুল হোসেনেরও ছিল এক স্বয়ম্ভর আপন পৃথিবী। তাঁর কবিপৃথিবী নিতান্তই আপন মনের রেখায় লেখায় চিত্রিত। আপন কথাটি জোর দিয়ে সামনে আনার কারণ, তিনি স্বভাবগত ভঙ্গিতে নিজের ভেতর ডুবে থাকার কবি। অল্প বয়সে *নববসন্ত* বের করে পাতার পর পাতায় পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে রেখে গেছেন তাঁর সাক্ষ্য। শুরুতেই হতে চেয়েছেন আর সবার চেয়ে আলাদা। কবিতায় পরিপূর্ণ সেন্টিমেন্টকে নিয়ে আসবেন কিন্তু সামান্য সেন্টিমেন্টাল হওয়া যাবে না, এই ছিল তাঁর সাধনা। আর ভঙ্গিতে হতে হবে সংহত সংযত সুমিত। ভাষা হবে একেবারে আটপৌরে, মুখের ভাষার কাছাকাছি। এভাবেই নিজের দিকটা নির্ণয়ের জন্য কোন পথে যাবেন তার নিশানা প্রথম থেকেই ঠিক করে নিয়েছিলেন। প্রথম কবিতার বইয়েই নিজ ঠিকানা নির্ধারণ করে নেওয়ার ব্যাপারটা সবার পক্ষে হয়ে ওঠে না। যাত্রা শুরুর উচ্ছ্বাসে ভাসতে ভাসতেই প্রায় সব কবির প্রথম বইটি বের হয়। তারপর ধীরে ধীরে পরিণতি ও রূপান্তরের অভিমুখে তীর ছোড়ার কাজটি চলতে থাকে আমরণ। আবুল হোসেন তাঁর তীরটি নিক্ষেপ করেছেন যাত্রাকালেই এবং লক্ষ্যমুখীও হয়েছেন। তাঁর আলাদা হওয়ার ব্যতিক্রমী আবেগটি এখানেই। ১৮ বছর বয়সে প্রকাশ ঘটল তাঁর কাব্যবোধের *নববসন্ত*। রীতিমতো তাক লাগিয়ে দেওয়ার মতো কাজ করলেন। ওই বয়সে লিখলেন প্রথম কবিতার বই। প্রথম বইয়েই কোন স্বরে কাব্যবয়ান সৃষ্টি করবেন তার 'দিক নির্ণয়' করে রেখেছিলেন। লিখলেন এই নামে একটি কবিতাও :

কোন দিকে যাব, ডাইনে না বাঁয়ে
অথবা যে পথ সোজা চলে যায়,
যে পথে গেছেন পিতা পিতামহ,
যে পথে পথিক চলে অহরহ,
অথবা যে পথ অচেনা অজানা,
জানা নেই যার নাম ও নিশানা,
যে পথে সঙ্গ নেই ক' তেমন,
যে ক'জন আছে তারাই নূতন
অথবা যে পথে পায়ের চিহ্ন
পড়েনি কখনও, দিকও ভিন্ন,
বাতাস বিরূপ, সময় বৈরী,
মাটিও বা বুঝি হয়নি তৈরি,
যে পথে দুপুরে নামে ঘন রাত
বাড়িয়ে দেবে কি সেই দিকে হাত?
পথটা সোজা না বাঁয়ে না ডাইনে
জানিনে জানিনে জানতে চাইনে।
শুধু জানি এই সেটা নিজেকেই
নিতে হবে চিনে যথা সময়েই।
('দিক নির্ণয়', *নববসন্ত;* আবুল, ১৯৭৭ : ৫৮)

নববসন্ত বেরিয়েছিল মোট দুটি সংস্করণে। প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল ১৯৪০ আর রচনাকাল ১৯৩৮-১৯৪০। দ্বিতীয় সংস্করণের রচনাকাল ১৯৪০-১৯৪৩, বেরোয় ১৯৭৭-এ। দ্বিতীয় সংস্করণে কবি যোজন-বিয়োজন বর্জন-পরিমার্জন করে *নববসন্ত*কে নবরূপে নিয়ে আসেন। 'দিক নির্ণয়' কবিতাটি স্থান দিয়েছেন পরের সংস্করণে। রচনাকালের বিচারে কবির বয়স তখন আঠারো থেকে একুশের ভেতর। ১৮ লাইনের কবিতায় ১৮ থেকে ২১ বছর বয়সে স্বকণ্ঠ নির্ণয়ের 'নিশানা' ঠিক করে নিয়েছেন, এ কম কথা নয়। এই কবিতায় নব্যতরুণ কবি অতি সতর্কে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন কারো পদাঙ্ক অনুসরণে পথ হাঁটবেন না। নিজের নির্ণীয়মাণ পথেই যাবেন, নিজেকেই সে পথ বাতলে নিতে হবে। হোক তা দুর্মর। এগোবার পথে মাটিও তৈরি হয়নি, বাতাস বিরূপ আর সময়ও বৈরী। তবু যাবার জন্য পা রাখার মাটি আর সামনে এগিয়ে যাওয়ার সীমানা ও দিক তাঁকে নির্ণয় করে নিতে হবে। সেজন্য হৃদয়ের সকল বাসনা দিয়ে নিজেকেই সে পথের দিক আবিষ্কার করতে হবে বলে আত্মপ্রত্যয়ী অঙ্গীকার করেন।

সকলের সঙ্গে থেকেও কবিরা চিরকাল আলাদা হয়ে বাঁচার স্বপ্ন দেখেন। আলাদা পরিচয়ে পুষ্ট হতে চান বলেই নিজের কল্পনার সীমারেখাই শেষপর্যন্ত তাঁর কবিপৃথিবীর সীমানা হয়ে দাঁড়ায়। কবি প্রকৃত প্রস্তাবে নিজেকেই লেখেন — নিজের চিন্তা, ভাবনা, আবেগ ও কল্পনার ভেতর ডুব দিয়ে এমন-এক কাব্যবিশ্ব সৃষ্টি করে চলেন যেখানে আত্মস্বভাবই কবির প্রাণরূপে জায়গা করে নেয়। 'আবুল হোসেনের কবিস্বভাবের বৈশিষ্ট্যই এটি যে, তিনি কাউকেই উপদেশ দিতে নারাজ, নিজেকে নিয়েই তাঁর পথপরিক্রমা। তিনি নিজের ইচ্ছা, অনিচ্ছার কথা জানান দিতে চান; কিন্তু চাপিয়ে দিতে চান না। এমনকি স্রষ্টার কাছেও যখন কিছু চান, সেইটিও নিঃশব্দে সারতে চান।' (সৌভিক, ২০১১ : ৩৪৮) আবুল হোসেন চল্লিশের কবি, তাঁর থেকে চার দশক দূরের কবি শিহাব সরকার বলেন, আবুল হোসেনের দীর্ঘ ধারাবাহিক অবিচল বিশ্বাসের কথা : 'চল্লিশের কবিরা জীবনের বিভিন্ন ধাপে কবিতার বিষয় থেকে বিষয়ে গেছেন, ভাষা বদল করেছেন, বিশ্বাসেও পরিবর্তন এনেছেন। কিন্তু আবুল হোসেন পদচ্যুত হননি। তিনি একটি নির্দিষ্ট পথ ধরে বরাবর এগিয়ে গেছেন। এই বয়সেও একই ধারাবাহিকতায়, অনেকটা একই সুরে, তিনি অননুকরণীয় এক প্রশান্ত ভঙ্গিতে নিজের এবং চতুষ্পার্শ্বের স্নিগ্ধ এবং রূঢ় স্পন্দনগুলোর কথা বলে চলেছেন। আবুল হোসেনের এই পোয়েটিক ইনটিগ্রিটি বাংলা কবিতায় বিরল। এটি বাংলা ভাষার চল্লিশের দশকের কবিতায় তাঁকে স্বতন্ত্র অবস্থান দিয়েছে।' (শিহাব, ২০১১ : ১৭৩)

আবুল হোসেন নিজনির্মিত কবিভুবনে তাঁর স্বস্তি খুঁজে পান। বর্তমান লেখায় মাঝে মাঝেই তাঁর কিছু নির্জলা ভাষ্য থেকে তাঁর সচেতন আবেগী মনের কথা আমরা মিলিয়ে নেব। মনে পড়ছে, ১১ বছর আগে কবির ধানমণ্ডির 'সাহানা' নামের সাদা দেয়ালঘেরা বাড়িতে একবার গিয়েছিলাম। সেদিন ছিল কবির ৮১তম জন্মদিন। জীবনের যোগ-বিয়োগ নিয়ে অনেক কথা হয়েছিল সেদিন। মনে আছে এক পর্যায়ে তিনি খুব আবেগমগ্ন হয়ে কতকগুলো দার্শনিক বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন। সেগুলো রেকর্ডারের কফি রঙের ফিতার গায়ে এখনো লেগে আছে। বললেন, 'জানি না কী থাকবে কী থাকবে না। আমার মোটামুটি

সান্ত্বনা হল, এই যে আমি আমার নিজের কাজ করে যেতে পেরেছি। সে কাজ আমি আমার নিজের মতো করেছি। আমি সে কাজ একা একা করেছি। নির্জনে আপন মনে করেছি। সে কাজ যে কারো কখনো কাজে লাগবে সেটা ভেবে করিনি। অথবা মানুষের কাছে, পৃথিবীর কাছে আমি যা পেয়েছি সেই দেনা শোধ করবার জন্য আমি লেখালেখি করিনি। আমি আমার নিজের মনে, নিজের হৃদয়কে উজাড় করে দিতে চেয়েছি। যা পেয়েছি মানুষের কাছে, এই পৃথিবীর কাছে, তার শোধ আমি দিতে চাই না। আমি মনে করি সে আমার। আমি তা ফিরিয়ে দেব কেন? আমি ফিরিয়ে দেব না। আমি যা দিয়েছি, তা দিয়েছিই, আমিও তার কোনো প্রতিদান চাই না।' (অনু, ২০০৩ : ১৭) কবির সবচেয়ে ভালো থাকা মানে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত লিখে যেতে পারা। শুধু বেঁচে থাকাই বড় কথা নয়। কবি যদি মানুষের ভালোবাসায় আরো অনেক বছর বেঁচে থাকেন সেই সময় ধরে কিছুই লিখতে না পারেন, তাহলে বেঁচে থেকে কী হবে? ওই বেঁচে থাকায় কোনো লাভ নেই। আবুল হোসেনের দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার সার্থকতা এখানেই যে, তিনি মৃত্যুপূর্বকাল পর্যন্ত ছিলেন সৃষ্টিশীলভাবে সক্রিয়। ১৮ বছরের তরুণ আধুনিক কবিতার পথ ধরে যেভাবে যাত্রা করেছিলেন বিরানব্বইয়ের দরোজা পার হয়ে তাঁর সেই অক্লান্ত গতিবেগ কি থেমেছিল? থামেনি। কবিতার প্রতি সুতীব্র আকর্ষণ তাঁকে আবেগে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। কবিতা লিখে মানুষের ভালোবাসা পেয়েছেন। সেই ভালোবাসাই কবির লেখালেখির শক্তি। কবি সেই শক্তিতে অবলম্বন করেই আমরণ সৃষ্টিপ্রয়াসী হয়ে আছেন।

কবি হিসেবে আবুল হোসেনের একাগ্রতা, বাকসংযম, আধুনিক-নাগরিক মনন, মুখের আটপৌরে ভাষাকে আধুনিক কাব্যভাষায় প্রতিস্থাপন করা এবং সর্বোপরি বাংলা কবিতায় নতুন মেদহীন কাব্যবোধ ও ভাষা উপহার দেওয়ার কথা সমকালীন কে না স্বীকার করবেন! কাব্যভাবুক উত্তরপ্রজন্মের প্রায় সকলেই তাঁর এসব বৈশিষ্ট্যের কথা খোলা মনে প্রকাশ করবেন। সমকালীন বিভিন্ন বয়সের কয়েকজন কবি-সমালোচক-গবেষক-লেখক ও চিন্তকের অসংখ্য মন্তব্যে তাঁর পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। কয়েকটি নির্বাচিত মন্তব্য :

শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬) —
কবি আবুল হোসেনের নিবাসে বিভিন্ন পর্যায়ে এতবার গিয়েছি, এত আহার্য গ্রহণ করেছি, তাঁর কাছ থেকে এত স্নেহ, এমন বন্ধুতা পেয়েছি যে তা কোনো পরিমাপক যন্ত্রে তৌল হতে পারে না। তাঁর কাছ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা আমাকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ত্রুটিমুক্ত থাকতে সাহায্য করেছে। কবিতায় সংযমের কথা তিনি বারবার আমাকে বলেছেন। (শামসুর, ২০১১ : ১২)

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী (জ. ১৯২৮) —
আবুল হোসেন আমাদের একমাত্র নির্ভেজাল নাগরিক কবি। নাগরিক শুধু এই অর্থে নয় যে তিনি পূর্ণিমার চাঁদ বা শরতের শিউলির কথা লেখেন না, লেখেন রেশন শপ, হাসপাতালের ট্রলি ইত্যাদির কথা। তিনি নাগরিক কবি প্রথম তাঁর চিন্তায়, দ্বিতীয় তাঁর ভাষায় ও ভঙ্গিতে। (জিল্লুর, ২০১১ : ১৪)

কায়সুল হক (জ. ১৯৩৩) —
দৈনন্দিন জীবনের ভাষা দিয়ে তৈরি হয়েছে তাঁর কবিতার শরীর। এ এক অনন্য প্রতিমা। (কায়সুল, ২০১১ : ৬৮)

> রশীদ করীম (১৯২৫-২০১১) —
> আবুল হোসেন আবেগকে বাঘের মতোই ডরান। অথচ তিনি তখনই ভালো লিখছেন, যখন আবেগকে কিছুটা জায়গা ছেড়ে দিয়েছেন। (রশীদ, ২০১১ : ৬৮)
> আবুল মোমেন (জ. ১৯৪৮) —
> আবুল হোসেন চোখ-কান খোলা সচেতন আধুনিক মানুষ। (আবুল মোমেন, ২০১১ : ৩৪৩)
> আবদুল মান্নান সৈয়দ—
> নজরুলোত্তর আধুনিকতার ধারক এই কবি ভাবের ছলছলানি (তাঁর ভাষায়) এড়িয়ে কবিতাকে করতে চেয়েছিলেন কৃশ, ঝকঝকে, মুখের ভাষা তথা জনসাধারণের কাছাকাছি। নজরুলকে যদি বলি হৃদয়শীল জনতার কবি, আবুল হোসেন বুদ্ধিবাদী জনতার কবি। (আবদুল মান্নান, ২০১১ : ১২২)

উপরের খোলা মন্তব্যে কমবেশি সবাই আবুল হোসেনের প্রকরণনিষ্ঠা, স্টাইল ও ভাষাভঙ্গির অভিনবত্বের চেহারাটি উন্মোচন করেছেন। বর্তমান অনুচ্ছেদের শুরুতে আমরা বলেছিলাম কোনো কবি অপর কোনো কবির আদর্শে বশীভূত হন না। কবি নিজেই তাঁর আপন আদর্শের স্বরূপটি নির্ণয় করে নেন সময়ের তালে ধীরে ধীরে। আবুল হোসেন নিয়েছেন তাঁর যাত্রাকালে, প্রথম বই *নববসন্ত* থেকেই। তবে সবারই তো একটি পূর্বপাঠের গহিন হৃদয় থাকে, সেখান থেকে মননে বিচ্ছুরিত হয় অভিনব কিছু সৃষ্টির চিন্তা। আবুল হোসেনও নিশ্চয় তাঁর ব্যতিক্রম নন। নিঃসন্দেহে তিনিও পূর্বপাঠের অভিজ্ঞতায় তাঁর নতুন চিন্তার বাতি জ্বালিয়েছেন। যতদূর জানা যায়, বাংলা কবিতায় একমাত্র সমর সেন ছাড়া তিনি আর কোনো কবির সরাসরি প্রভাবের কথা স্বীকার করেননি। তাঁর আত্মভাষ্য, 'বাঙালি কোনো কবির প্রভাব আমার মধ্যে পড়েছে একথা আমার মনে হয় না। আমি সমর সেনের কাছ থেকে একটা জিনিস শিখেছি সেটি হচ্ছে কবিতার ভাষাকে গদ্যের কতটা কাছাকাছি নেওয়া যায়। সমর সেনও খুব বড় কবি। তিনি কবিতাকে গদ্যের কাছাকাছি নিয়ে এসেছেন কিন্তু যেভাবে এনেছেন আমি সেভাবে সেইদিকে যাইনি। উনি সাম্যবাদের কবিতা লিখেছেন রোম্যান্টিকের মতো। তাঁর সাম্যবাদের কবিতার মধ্যে প্রচুর রোম্যান্টিকতা রয়ে গেছে। এছাড়া যে-ভাষায় কবিতা লিখেছেন সেটা গদ্যের কাছাকাছি হলেও তা আমাদের প্রতিদিনের কথাবার্তার ভাষা নয়।' (অনু, ২০০৩ : ১৭) সামনে চলার জন্য পথ যেমন অপরিহার্য, কবিতার প্রকরণের জন্য তেমনি স্বকীয় স্টাইল বা ভঙ্গি কবির পক্ষে বিশেষভাবে আরাধ্য। আবুল হোসেন কবিতার প্রকরণ বলতে নিত্যদিনের কথোপকথনের রূপটি যেমন নিয়েছেন, সেইসঙ্গে তিনি ছন্দের অন্তর্গত চালটি রেখেছেন, রেখেছেন মিলের সান্নিধ্যটিও। মুখের ভাষার সচলতার সঙ্গে ছন্দ ও মিলের মাপা গতিকেও তিনি কবিতার গতিমুখে জুড়ে দিয়েছেন। ফলে নতুন কাব্যভাষা সৃষ্টির পথে অভিনবত্ব এবং ঐতিহ্যের একটি মিলনও তিনি তাঁর কবিতায় স্থাপন করতে পেরেছিলেন। তাঁর উচ্চারণ,

> আমার কবিতার যে-ভাষা সে-ভাষাকে আমাদের প্রতিদিনের কথাবার্তার ভাষার কাছে নিয়ে গেছি। যে-ভাষায় আমি কথা বলছি, যে-ভাষায় আমরা আমাদের বৈঠকখানায় বসে কথাবার্তা করি সেই ভাষায় কবিতা লেখার চেষ্টা করেছি। কবিতার ভাষাকে গদ্যের কতটা কাছাকাছি নিয়ে আসা যায়, আমি সেই চেষ্টাটাই করেছি। এর সঙ্গে আমি ভিন্ন যা করেছি সেটা সমর সেন বা অমিয় চক্রবর্তী করেননি, সেটা হল এই গদ্যের চাল কবিতায় এনেও আমি ছন্দকে বিসর্জন দিইনি, মিলকেও বিসর্জন দিইনি। (অনু, ২০০৩ : ১৭)

তবে প্রভাব বলতে আবুল হোসেন খুলেই বলেছেন, তিনি তাঁর বাকসংযমী চেতনাটি নিয়েছেন রবার্ট ফ্রস্ট থেকে, 'আমি চেষ্টা করেছি কবিতাকে কত সহজ করা যায় কবিতাকে কত সহজ ভাষায় লেখা যায়। কত কম কথা বলে কত গভীরতা আনা যায়। এদিক থেকে আমার মনে হয় রবার্ট ফ্রস্ট আমার মধ্যে খুবই প্রভাব বিস্তার করেছে। সেইসঙ্গে ইয়েটসও আমার খুব পছন্দের কবি। বয়স বাড়ার সঙ্গে মানুষের জীবনের যে অভিজ্ঞতা এবং যে-অভিজ্ঞতাগুলোকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে রূপ দেওয়ার যে প্রচেষ্টা ব্যাপকভাবে থাকে সেই ব্যাপারটি আমি ইয়েটসের কাছ থেকে শিখেছি। আমার মনে হয় এই দুই কবির প্রভাব আমার মধ্যে পড়েছে। প্রভাব পড়লেও আমি আমার নিজের মতো করে কবিতা লিখবার চেষ্টা করেছি। (অনু, ২০০৩ : ১৭)

অভিজ্ঞতা যে শুধু রোম্যান্টিকতা নয়, বহু বর্ণে জীবনের অভিজ্ঞতাকে কবিতার খাতায় হাজির করা যায়, সেই ভঙ্গিটি আবুল হোসেন গ্রহণ করেছেন ইয়েটস থেকে, 'আমি যদিও ইংরেজি পড়িনি, আমার অনার্স ছিল অর্থনীতিতে আমার এমএ তে ছিল সমাজবিজ্ঞান। কিন্তু আমার সমস্ত ভালোবাসা ছিল সাহিত্য এবং কবিতা নিয়ে। আমি বাংলা কবিতা যেমন পড়েছি, ইংরেজি কবিতাও তেমনি প্রচুর পড়েছি। প্রথম দিকে আমার যৌবনে প্রিয় কবি ছিলেন টি এস এলিয়ট। পরে আর আমাকে এলিয়ট প্রভাবিত করেছেন এমন আমার মনে হয় না। অনেক পরে আমার দুজন কবি খুব পছন্দ হয়েছে তাঁদের একজন হলেন ডব্লিউ বি ইয়েটস আরেকজন হলেন আমেরিকান কবি রবার্ট ফ্রস্ট। ফ্রস্ট কবিতা সম্পর্কে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন, কবিতা হচ্ছে মানুষের অভিজ্ঞতার নির্যাস। এবং কবিতার মধ্যে আমি প্রাজ্ঞতা খুঁজে পাই। এই ব্যাপারটি আমার মধ্যে এসে গেছে।' (অনু, ২০০৩ : ১৭)

৪

নববসন্ত থেকেই আবুল হোসেন একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়াদির পাশাপাশি একটি প্রতিবাদী সত্তার পরিচয় রেখে গেছেন। যখন প্রতিবাদী হয়েছেন সমাজের কথা বলেছেন, দেশের কথা বলেছেন, একটি সুন্দর আদর্শিক জীবন গঠনের স্বপ্ন তিনি কবিতায় চিত্রিত করেছেন। ব্যক্তিতা থেকে সমাজের বৃহত্তর পরিমণ্ডলে যখন তাঁর চিন্তা পরিব্যাপ্ত হয়েছে তখন স্বাভাবিকভাবে তাঁর আমি-সত্তা রূপান্তরিত হয়েছে 'আমরা' বহুস্বরে। কাছের চেনাজগৎও তখন রূপ নিয়েছে সমষ্টিতে। সমষ্টি জীবনের কথা যখন তিনি হৃদয় ভরে অনুভব করেছেন তখন আর বরাবরের মতো চেনা শহরের অনুষঙ্গের ভেতর আটকে থাকেননি। তিনি সম্প্রসারিত হয়েছেন আরো বড় পরিসরে, গ্রামীণ জনপদের দিকে। এ সময় তাঁর চেতনায় সম্মিলিত হতে শুরু করে গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের কথকতা। চাষি, তাঁতি, কামার, কুমার, জেলে, করাতি আর হাজার হাজার মজুরের ঘামঝরানো পরিশ্রমের ঋণ কবি অপার আন্তরিকতা নিয়ে উপস্থাপন করেন। কবির কাছে মনে হয় অবারিত গ্রামবাংলার এই সাধারণ মানুষগুলোর চিরচেনা কাজগুলোই আমাদের কাছে 'অপূর্ব দৃশ্য'রূপে ভেসে আসে —

আমরা কি মনে রাখব দেখেছি যা দুই চোখে?
চাষী মাঠে ধান বোনে, সুতো কাটে তাঁতী,
শান দেয় কুড়ালে কামার, জেলেরা নদীতে ফেলে

জাল, ঘটি বাটি বানায় কুমোর, কাঠ কাটে করাতীরা,
রেঁদা ঘষে ছুঁতোর, ক্ষেতে কলে জান দেয় হাজার হাজার
মজুরেরা। ঝরে ঘাম ধারায় ধারায়,
ঝর্নার স্রোতের মতো জল পড়ে চোখের নাকের, মাটি
ভেজে বিন্দু বিন্দু রক্তে। আমরা দেখেছি সেই অপূর্ব
দৃশ্য। আমরা পেয়েছি তারই স্বাদ। তাই শুধু মনে রাখবার।
('উত্তরাধিকার', *নববসন্ত;* আবুল, ১৯৭৭ : ৩৬)

কবিতায় তিনি জনসাধারণের কথা জানাতে গিয়ে বাজার অর্থনীতির কথাও উল্লেখ করতে ছাড়েননি। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় দিনে দিনে দ্রব্যমূল্য হয়েছে আকাশছোঁয়া। বেঁচে থাকার জন্য মানুষের মৌলিক চাহিদা নিয়ে কেউ আর ভাবার মতো ফুরসত করে উঠতে পারেন না। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ঊর্ধ্বগতিতে মানুষ অসহায়, তবু মানুষের কথা ভাববার আর কেউ নেই, আবুল হোসেন তারই ক্ষোভ তাঁর কবিবোধের অন্তর্গত করেছেন —

অভাব শুধু নাই মানুষের।
চাই কত মণ, চাই কত সের,
আণ্ডা চাও বাচ্চা চাও
জোয়ান বুড়ো আসল ফাও।
চাহিদা নাই মানুষগুলার।
কেবলি তার পড়েছে বাজার।
('বাজার দর', *বিরস সংলাপ;* আবুল, ১৯৬৯ : ৯)

কেবল বন্ধু ও পরিবারপরিজন বেষ্টিত ব্যক্তিক অভিজ্ঞতা তাঁর কবিতায় স্থান দিয়েছেন, এমন নয়। সংবেদনশীল কবিমনের দায় থেকে তিনি দেশের মানুষের একান্ত ভাবনা ও অধিকারের কথাগুলোও সূক্ষ্ম সূক্ষ্মভাবে ভেবেছেন। দেশের জন্য কিছু করতে হলে দেশের মানুষের মনের ভেতর ঢুকে তাদের প্রাপ্য অধিকার আদায় ও চাহিদার বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে হবে। কবি আন্তরিকভাবে প্রত্যাশা করেন, যাঁরা দায়িত্বে আছেন খেটেখাওয়া সাধারণ মানুষের প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ করতে হবে। কবির লেখা 'স্বদেশী কোরাস' নামের কবিতায় তাঁর এই স্বদেশপ্রীতি খেটেখাওয়া সাধারণ মানুষকে ঘিরে উপস্থাপিত হয়েছে। দেশের মানচিত্র নিয়ে সবাই ব্যতিব্যস্ত কিন্তু দেশের মানুষের মনের ভেতর ঢুকে তাদের চাহিদার কথা কেউ আর জানতে আগ্রহী হন না —

আমাদেরও দেশ আছে,
আমাদের প্রাণের স্বদেশ-
মানচিত্রে আঁকা।
আঁকাবাঁকা রেখা টানা
সবুজে সবুজে মাখা বিচিত্রিত ভূমি
('স্বদেশী কোরাস', *বিরস সংলাপ;* আবুল, ১৯৬৯ : ৩৪)

আবুল হোসেন অনেক কবিতায় প্রকাশ করেছেন তাঁর প্রবল স্বাজাত্যবোধ। তাঁর স্বাজাত্যবোধে সংযোজিত হয়েছে স্বদেশের খালবিল, হাল কাঁধে চাষি, ফসলে ঢাকা ক্ষেত,

জলভরা নদী, চলন্ত ট্রেন, সুন্দরবন, নীল সমুদ্র, দাঁড় টানা মাঝি প্রভৃতি উপমানচিত্র। এক্ষেত্রে তিনি কখনো কখনো প্রতিবাদীও হয়েছেন, কিন্তু তাঁর বর্ণনায় শৈল্পিক অবধান সামান্যতম লঙ্ঘিত হয়নি। 'স্বদেশী কোরাস' নিয়ে কবি জানিয়েছেন, 'আমি যেভাবে কবিতা লিখেছি সেটা বিক্ষোভ বা প্রতিবাদের হোক কিন্তু সেটা কখনো স্লোগান হয়ে দাঁড়ায়নি। দেশপ্রেমের বন্যায় ভেসে গিয়ে যখন সবাই পাকিস্তান-পাকিস্তান করছিলেন, কায়দে আজমে মগ্ন ছিলেন তখন আমি তো অন্য কবিতা লিখছিলাম। আমি লিখছিলাম "স্বদেশী কোরাস"। স্বদেশী কোরাসে আমি বলবার চেষ্টা করেছি– আমরা নিজের দেশকে দেখছি, কিন্তু আমরা এই দেশকে ভালোভাবে উপলব্ধি করছি না। দেশ মানে কী? দেশ মানে তো দেশের মানুষ। দেশের মানুষকে তো দেখছি না। আমরা একটা মানচিত্র নিয়ে কেবল ব্যস্ত হয়ে পড়ে থাকি। "সচিত্র মাসিক"-এ তার ছবি ছাপা হতে দেখি। কিন্তু দেশের মানুষের মনের ভেতরে আমরা ঢুকি না। তাদের মনের কথা নিয়ে আমরা ভাবি না।' (অনু, ২০০৩ : ১৭) আবুল হোসেন শেষ জীবনেও সাধারণ মানুষের জীবনসংগ্রাম নিয়ে ভেবেছেন, কবিতা লিখেছেন। তিনি ব্যক্তি জীবন থেকে সমষ্টি জীবনে বারবার নিজেকে মেলে ধরেছেন তাঁর অনেক কবিতায়। কয়েকটি কবিতা ও সে-সম্পর্কিত বিবরণ —

ক.

সর্বত্র দেখা যায়, সবাই দেশ নিয়ে আন্দোলনে মুখর হলেও নিরবচ্ছিন্নভাবে দেশের মানুষের কথা তেমন কেউ ভেবে দেখেন না। সমষ্টি জীবন হবে দেশের জনমানুষকে ঘিরে। এই জনমানুষরাই শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় মানুষদের কাছে চরমভাবে উপেক্ষিত থেকে যায়। কবির বেদনার জায়গাটি সেখানে। দেশের ভেতর নানা নিরাশার পরিস্থিতি বিরাজ করলেও কবি আত্মবিশ্বাসী হয়ে দেশের মানুষের মনের কথাই বলতে চান —

আমাদেরও দেশ আছে।
আহা কী সরস মাটি!
এমন বাতাস কোন দেশে।
আমাদের গান মেশে
উত্তরে পশ্চিমে পুবে চলতি হাওয়ায়,
আওয়াজে ছড়ায়
দেশে দেশে, আমাদের প্রাণের স্বদেশ।
('স্বদেশী কোরাস', *বিরস সংলাপ;* আবুল, ১৯৬৯: ৩৬)

খ.

আমরা যেন মৃত মানুষের মতো প্রাণহীন হয়ে না পড়ি, এজন্য কবি সবাইকে জেগে উঠবার প্রয়োজনে উদ্বুদ্ধ করেছেন। কবি উপলব্ধি করেন, আমাদের দাঁড়াতে হবে সামবায়িক চেতনার উপর শক্ত ভিত গেঁড়ে। কারণ কবি জানেন, সমবায়ী সত্তার মধ্য দিয়ে জেগে উঠবে বহুস্বরী হৃদয়। 'আমরা' বহুবচনে সমষ্টি মানুষের সমীপে কবির আকুল আহ্বান —

আমরা তো মরে গেছি, আমাদের প্রাণহীন মমি
পাথরে খোদাই মূর্তি। অস্থিসার নির্বাক কঙ্কাল

সনাতন পিরামিড ঐতিহ্যের ধূসর গুহায়
রয়েছে দাঁড়ায়ে আজো। দক্ষিণের বাতাস মরমি
বয়ে যায়, জাগে না স্পন্দন কোনো আমাদের মনে
অন্তঃসারশূন্য ফাঁকা আমরা খোলস একতাল।
('মমি', *নববসন্ত;* আবুল, ১৯৪০ : ২০)

গ.
নানা মাত্রায় কবি সমাজসমষ্টির ভেতর প্রবেশ করেন। সমষ্টি মানবকে নতুনভাবে অনুপ্রাণিত করার জন্য তাদের দুর্বলতা ও ব্যর্থতার জায়গাগুলো কবি প্রথমেই শনাক্ত করে তা সংশোধনের পথ দেখাতে চেয়েছেন —

আমাদের ক্লান্ত চোখ ঘুমে মুদে আসে,
স্বপ্নরা পারে না আর উড়তে আকাশে
ভ্রাম্যমাণ পাখা আর অশ্রান্ত শাখায়।
আমরা পাইনি তৃপ্তি উড়ন্ত ডানায়।
('স্বপ্ন', *নববসন্ত;* আবুল, ১৯৭৭ : ৩০)

ঘ.
সমষ্টির নিকটে আহ্বান রাখতে গিয়ে জনতার কথা, মিছিলের কথা ও নবযুগের কথা উত্থাপন করতেও পিছ পা হননি কবি —

সেই জনতার দীপ্ত মিছিল ধরে
নবযুগ আসে রক্ত দিনের ভোরে।
('পোস্টার', *নববসন্ত;* আবুল, ১৯৭৭: ৩৮)

কবিপ্রতিভার বলে কবি অনুভূতির একটি দ্বিতীয় রূপ দিয়ে থাকেন কবিতায়। আধুনিক সাহিত্য সমালোচনায় এই রীতির একটি নামও আছে — ডিফ্যামিলারাইজেশন। বাংলায় কেউ কেউ একে বলেছেন অবিদিতিকরণ। খুব সহজ ও অবলীলায় হৃদয়ঙ্গম হওয়ায় আবুল হোসেনের কবিতায় আপাতদৃষ্টিতে অনুভূতির এই দ্বিতীয় রূপ বা ডিফ্যামিলারাইজেশন উপস্থিত কি না তা নিয়ে কখনো কখনো সংশয় জাগতে পারে। এই যে বারবার ভাষা ও অনুষঙ্গ পরিমার্জনের চেষ্টা এটিই তাঁর কবিতার অবিদিতিকরণ। আবুল হোসেনের ক্ষেত্রে বরং ভাবনার রূপান্তরকরণ বিষয়টি বেশিমাত্রায় প্রযোজ্য। কবি যখন বলেন, 'এক একটি কবিতা আমি বহুবার লিখি, বহুদিন ধরে লিখি। *নববসন্ত* বেরুবার কিছুদিন পর থেকেই এটা আমার স্বভাবে দাঁড়িয়ে যায়। এক একটি শব্দ, চরণ, কবিতা বহুদিন ধরে মনে মনে ভাবি, আওড়াই। কখনো কখনো কাগজের পাতায় লিখবার পূর্বেই প্রায় সমস্ত কবিতাটি মনে মনে লেখা হয়ে যায়। তবু যতদিন বেঁচে আছি কোনো লেখা সম্পর্কেই আমি এ কথা বলতে পারব না এটাই শেষ পাঠ।' (আবুল, ১৯৭৭, ভূমিকা : ৭) এই প্রক্রিয়ায় তিনি ডিফ্যামিলারাইজেশনের কাজটিই করেছেন। তিনি সব সময় নিয়োজিত থেকেছেন তাঁর ভাবনাগুলোকে কত সহজে বাকসংহতির মধ্য দিয়ে ব্যক্তিক থেকে নৈর্ব্যক্তিকে এবং বস্তু থেকে নির্বস্তুতে রূপান্তর করা যায়। কবির ইনটেনশন বা অভীষ্ট সব সময় জেগে থাকে ভাবনা-রূপান্তরের দিকে মুখ চেয়ে। আবুল হোসেনের ইনটেনশন সেই রূপান্তরের দিকে। এসথেটিক লেজিটিমেশন বা নান্দনিক শর্ত পূরণে কবি বিষয় হিসেবে জীবনের জটিলতা নিয়ে যান দার্শনিক রূপনির্মিতির মধ্যে।

নান্দনিক শর্ত পরিপূরণে অনেক কবিতায় আবুল হোসেন রাতের ঘনবদ্ধ নিস্তব্ধতার পরিবেশটি বেছে নিয়েছেন। তাঁর সৃষ্টিশীলতার সর্বোচ্চ অনুরণন রাতের গভীরেই বেজে ওঠে বেশি। সারা জীবন উপমানচিত্র বা জীবনের নানা ছবি নিয়ে যত চিত্রকল্পের বাণী তিনি দিয়ে গেছেন খুব সম্ভবত তার অধিকাংশই রাতের গভীরতা সৃষ্টিকারী আবহ দিয়ে ঘেরা। *নববসন্ত* থেকে *কালের খাতায়* পর্যন্ত তাঁর কবিতাবলি পাঠ করলে পাঠক নিশিপ্রেমী আবুল হোসেনের একটি বিশিষ্ট পরিচয় অনায়াসে পাবেন। বহু রাত্রি তিনি বিনিদ্র থেকেছেন কবিতার জন্য। মনে হবে মাঝ নদীতে চিত্রকল্প সন্ধানের জন্য কবিতার জাল ফেলে রাতের পর রাত কাটিয়ে দিয়েছেন একান্ত অন্তরঙ্গে। শেষপর্যন্ত রাত প্রতীকায়িত হয়েছে তাঁর সৃষ্টিশীল সংবেদনায়, তাঁর কবিতার খাতায়। কত কত রাতের নদীতে তিনি চিত্রকল্পের জন্য জাল ফেলে বসেছিলেন তার কয়েকটি নমুনা আমরা এবার হাজির করব —

ক.

সৃষ্টির ভাবনা কবিকে পেয়ে বসে। নতুন কিছু সৃষ্টির আগমনে তাই পায়ের শব্দ শুনতে পান কবি। রাত জেগে কান পেতে তার অপেক্ষায় থাকেন —

হাওয়ায় কার হাওয়ায় কার পায়ের শব্দ শুনি,
কান পেতে দ্বারে সারা রাত জেগে রই,
আসে আসে সে যে শুয়ে শুয়ে শুধু জানি।
('নবযুগ' *নববসন্ত;* আবুল, ১৯৪০ : ১১)

খ.

রাত আর দিন, ২৪ ঘণ্টাসময়ের দুই ভাগের মধ্যে রাতই কবির সৃষ্টিমানসের জন্য প্রমিত ক্ষণরূপে প্রতিভাত হয়েছে তাঁর চেতনায় এবং কবিতায়। রাত কবির সংবেদনাবাহী সত্তায় এমনই স্বয়ম্ভু আবেদন সৃষ্টি করেছে যে দুপুরের সময়কেও রাতের গভীরতার ভেতর ঠাওর করেন —

যে পথে দুপুরে নামে ঘন রাত
বাড়িয়ে দেব কি সেই দিকে হাত?
('দিক নির্ণয়', *নববসন্ত;* আবুল, ১৯৭৭ : ৫৮।)

গ.

*নববসন্তে*র বিখ্যাত এক কবিতা 'ডাইনামো'। শহরের নিস্তব্ধ নিঝুম রাতে একদা কবি ডাইনামোর একটানা ধ্বনি শুনতে পান। রাতের গহিন পরিবেশে ডাইনামোর ধ্বনি কবির মনে শৈল্পিক স্পন্দন তৈরি করে। আশপাশের গাছের শাখায় পাতায় এবং আকাশের দিকে সেই স্পন্দন ছড়িয়ে পড়ে। কবির শিল্পীমনের লেন্স দিয়ে দেখা এইসব ব্যাকুলতা শেষ পর্যন্ত খুলে দেয় সৃষ্টির আরো গভীর ধাপে পা রাখবার স্বপ্নের সিঁড়ি। সমস্ত পরিবেশ মিলিয়ে কবি গাঁথেন অপূর্ব সব চিত্রকল্প —

কাল মোর এতটুকু হয় নাই ঘুম,
সারা রাত কাটিয়েছি জেগে বিছানায়,
অদূরে পথের পাশে অবিরাম সুরে
ডাইনামো একটানা দ্রুত ধ্বনি তোলে।
শহর গভীর ঘুমে নিস্তব্ধ নিঝুম,

সে শব্দ কাঁপন তোলে শাখায় পাতায়,
আকাশে উঠছে তার গান ঘুরে ঘুরে,
আমার নয়নে সে যে স্বপ্ন-সিঁড়ি খোলে।
('ডাইনামো', *নববসন্ত;* আবুল, ১৯৪০ : ১৬)

ঘ.

শিল্পসৃষ্টির জন্য প্রয়োজন নিরবচ্ছিন্ন মনঃসংযোগ। রাতের নির্জন পরিবেশ সেই মনঃসংযোগ স্থাপনের কাজটি অনুঘটের মতো করে যায়। আর এ কারণেই রাত কবির নিকটে এক প্রিয়প্রতিম প্রেম। শুধু ডাইনামো নয়; রাতের গভীরতায় ট্রাম, বাস এবং শহরের নিস্পন্দ আকাশও কবির মনের ভেতর আলোড়ন তোলে —

স্তব্ধ রাত, কুয়াশা নিবিড় কাল,
প্রাসাদ পাহাড় দূরে
অন্ধকারজুড়ে প্রেত।
নিস্পন্দ আকাশ।
ট্রাম বাস মোটরের বিভ্রান্ত আওয়াজে
মাঝে মাঝে ঝালাপালা কান।
('পটভূমি', *নববসন্ত;* আবুল, ১৯৭৭ : ৪০)

ঙ.

কেন এত রাত্রিপ্রেম? হয়তো কবির মনের ভেতর থেকে উত্থিত আবেগগুলো রাতেই বেশি দানা বাঁধে — তখনই কেবল মনের কামরা খোলার সময় হয়, কবিতা লেখায় আসে গতি —

আলো নিভিয়ে শুয়েছি যেই
ঘুচল সব সন্দেহ, সংকোচ,
বেরিয়ে আসে দুর্বার বন্যায়
বুকের মধ্যে লুকানো কথাগুলো,
ঘরের মধ্যে অন্ধকার শুনি
দমকা হাওয়ায় মনের কামরা খোলার মাতামাতি।
('আলো নিভিয়ে', *নববসন্ত;* আবুল, ১৯৭৭ : ৪৭)

চ.

কবির প্রিয় প্রতীক ট্রেন ও ট্রেনের হুইসিল। এই উপমানচিত্রও তাঁর কবিতায় নানা প্রসঙ্গে বারবার এসেছে; তাও রাত্রির আবহে পূর্ণতা পেয়ে —

অবিরাম হুইসিল বাজে। ট্রেন আর ট্রেন,
কোলাহলময় রাত্রিদিন। ট্রেন আসে, থামে, হাঁটে, ছুটে যায়।
উড়ন্ত সময়, মেল, গুডস, সাটল, স্পেশাল, প্যাসেঞ্জার,
অবিশ্রান্ত গতি বাধা ইস্পাতের আগুনে চাকায়।
('ট্রেন', *নববসন্ত*; আবুল, ১৯৭৭ : ৫৩)

কিংবা

বাঁকানো শিং বুনো বাইসন এই ট্রেন
শিলিগুড়ি থেকে উঠছে দার্জিলিঙ।
('ডি. এইচ. রেলওয়ে', *বিরস সংলাপ;* আবুল, ১৯৬৯ : ৫৮)

শিল্পীরা যেহেতু মনের ভেতর তাঁদের একান্ত সংসার ফেঁদে বসেন, সেখানে সঙ্গত কারণেই নিঃসঙ্গতা, একাকিত্ব তাঁদের মনের দরোজায় এসে মাঝে মাঝেই কড়া নাড়ে। এজন্য শিল্পীদের ভেতর জমে থাকে একধরনের স্থায়ী নৈঃসঙ্গ্যবোধ। আবুল হোসেনের কবিসহৃদয়েও তার ভিন্নতা ঘটেনি। *দুঃস্বপ্ন থেকে দুঃস্বপ্নে* কবিতার বইয়ে তাঁর নৈঃসঙ্গ্যবোধের মাত্রা বেড়ে যায়। 'আমি প্রায় একা/নিঃসঙ্গ বলা যায়।' (আবুল, ১৯৮৫ 'যার যে পথ', *দুঃস্বপ্ন থেকে দুঃস্বপ্নে*; আবুল, ১৯৮৫ : ৯)। পুরোনো স্মৃতি আর বর্তমানের নানা অভিজ্ঞতা তাঁর এ কাব্যে স্থান পেয়েছে। পূর্বের হালকা শ্লেষ, ব্যঙ্গমিশ্রিত চেতনা থেকে সরে এসেছেন। বলা যেতে পারে, একেবারে নিরাবেগ, নির্লিপ্ত ও নিঃসংশয় মানসিকতা নিয়ে তিনি উপস্থিত হয়েছেন। তবে কোথাও তাঁকে নীরক্ত পাংশুতার প্রভাবে বিমর্ষ মনে হয়নি, বরং ধ্যানী কবির গভীরতা নিয়ে শক্তিমান চিত্রকল্প নির্মাণে সচেষ্ট হয়েছেন। ব্যক্তিগত উপলব্ধি, আর্তি ও নস্টালজিয়াকে তিনি অলংকারহীনভাবে প্রকাশ করেছেন কবিতায় : 'মানুষ কি করে মরার আগেই মরে যায়?' ('বিকর্ণের বিস্ময়. *দুঃস্বপ্ন থেকে দুঃস্বপে;* আবুল, ১৯৮৫ : ২৯)। এ কাব্যে তাঁর দার্শনিক উপলব্ধির অনুরণন ঘটেছে বারবার। অক্ষরবৃত্তের বৈচিত্র্য ও স্পন্দিত গদ্যছন্দের প্রবহমানতায় বাকসংযমী মনের ভেতর দিয়ে নিরপেক্ষ-নির্লিপ্ত দর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন কবি। পৌনঃপুনিক ক্যাটালগ, অ্যালিটারেশন, কিংবা ধ্বন্যাত্মক বাক্য এ কাব্যে নেই। নিরবচ্ছিন্ন গতিতে ঋজুতার সঙ্গে তাঁর চিন্তনকে একটি প্রবহমান স্রোতের কাছে নিয়ে গেছেন। কোথাও পথরুদ্ধ হয়নি তাঁর এ গতি। যে স্বপ্ন শিল্পের পথনির্মাণে তাঁকে প্ররোচিত করেছে, সেই স্বপ্নই আজ তাঁকে পথ দেখিয়েছে জীবনের সংশ্লেষ নির্মাণে। *এখনও সময় আছে* কাব্যগ্রন্থে এসব চিন্তা আরো ব্যাপকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। নাগরিক জীবনের বিচ্ছিন্নতা তাঁকে কুঁকড়ে দিয়েছে মাঝে মাঝেই। কবি শিল্পবোধে অনুরণিত হয়ে প্রতীক-রূপকে নিজেকে মিলিয়েছেন বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টিকারী শহরের সঙ্গে :

এই গুঁড়ি উপড়ানো
থ্যাতলানো থাম
ভিত নড়ে যাওয়া
লোহা ইট পাথরের
দাঁত বের করা
কাচের শহরে
তোমার মতন আমি
ঝড়ে পড়ে ঘরছাড়া
ফুটো আকাশের নিচে
জখমি ডানায় সঙ্গীহারা
উজান বাতাসে উড়ে উড়ে
খড়কুটোহীন
সারা দিন
পায়ের ওপর ভিজি।
('ভিজে কাক', *এখনও সময় আছে;* আবুল, ১৯৯৭ : ৯)

ব্যক্তিপৃথিবীর সঙ্গে বাস্তবপৃথিবীর একটি বোঝাপোড়া কবিকে সব সময় করে চলতে হয়। চারপাশের বৃহত্তর বাস্তবতা আর দশজনের মতো কবিকেও আমন্ত্রিত করে। খেলার মাঠ, নারীদের ভালোবাসা, ফুসফুসের ব্যাকুল নিশ্বাস প্রশ্বাস সবই কবিতাকে অবলম্বন করে নিবেদিত হয়েছে। কবিতার জন্য বাস্তবপৃথিবীর মোহ ছেড়ে অনেক সময় কবিকে ব্যক্তিপৃথিবীর একাকী ভাবসংসারে নিয়োজিত রাখতে হয়। এবং কবির এই নিয়োজনের কাজটি চলছে শৈশব থেকেই, ফলে চারপাশের বাস্তবতার ভেতর অবস্থান করেও কবি কবিতার জন্য হয়েছেন আলাদা এক নির্জন মানুষ। শিল্পের দায় মোচনের কারণে এই জীবন দোলাচলের অনুভূতিটি মাঝে মাঝেই কবিকে আচ্ছন্ন করে রাখে—

ঘর ছেড়ে এসেছিলাম সে কবে,
মুগ্ধ কিশোর, কবিতার হাত ধরে।
তাকেই দিয়েছিলাম আমার
গোপন বসার একলা খেলার মাঠ,
অজানা সুদূর ধূসর বিজন
সে পথের খোঁজ যেখানে স্বপ্নে হাঁটি
দিয়েছি আমার যাযাবর দুই চোখ,
বিনিদ্র ফুসফুসের ব্যাকুল
নিশ্বাস প্রশ্বাস,
দিয়েছি আমার নারীদের ভালোবাসা।
তবু সে আমার রাত্রি জাগার,
অসহ জ্বালার সাক্ষী।
('ভুল ভালোবাসা', *এখনও সময় আছে;* আবুল, ১৯৯৭ : ৭২)

নববসন্তের পর *বিরস সংলাপ*, *হাওয়া*, *তোমার কি দুঃসাহস*, *দুঃস্বপ্ন থেকে দুঃস্বপ্নে*, *এখনও সময় আছে*, *আর কিসের অপেক্ষা*, *রাজকাহিনী* কিংবা *কালের খাতায়* — প্রায় প্রতিটি কবিতার বইয়ের নামের মধ্যেই আমরা লক্ষ করি, একটি সংকটাপন্ন সমাজ ও সময়ের বাসিন্দা তিনি। তারপরও বলা চলে, 'তাঁর কবিতার নায়ক সেই অতৃপ্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণি — যারা দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্গত ও বহির্গত অবক্ষয়কে ধারণ করেও মুক্তির স্বপ্ন দেখতে চায়, বর্তমানের নৈরাশ্য, হতাশা ও বিপর্যয়কে অঙ্গীকার করে কখনো হয়ে ওঠে আধুনিক নগরসভ্যতার যথার্থ প্রতিচ্ছবি, কখনো অতৃপ্ত প্রণয়ের তাৎক্ষণিকতায় ভারাক্রান্ত; আবার কখনো-কখনো পরিবর্তনশীল সময় ও সমাজের সমগ্রতার প্রতিমূর্তি।' (রফিকউল্লাহ, ১৩৯০ : ৯) আবুল হোসেন চেয়েছেন শোষণমুক্ত এক সমৃদ্ধ সমাজ। কিন্তু দায়িত্বশীল উপরের মানুষগুলো নিজের আখের গোছাতেই ব্যস্ত। নিঃস্বদের দেখার মতো কেউ নেই। এই বেদনা কবির কোমল হৃদয়কে ব্যথিত করেছে শতবার। সেই বেদনাবোধের ধারাই তিনি তাঁর বেশ কিছু কবিতায় যুক্ত করেছেন নানা মাত্রায়। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র সমস্ত ঘিরে সেই অভিব্যক্তি। কয়েকটি উদাহরণ —

ক.

কবির চিন্তায় যুক্ত হয় ক্ষোভের তাৎক্ষণিক মনোভঙ্গি। রাগে-দুঃখে আক্রান্ত হলে তাই নিয়ে কবি রচনা করবেন কবিতা। যেকোনো আক্ষেপের ঘটনা বা মুহূর্ত হতে পারে

কবির কবিতার বিষয়। কবিতাকে কেবল শৈল্পিক ব্যঞ্জনার বাহন না করে জীবনের সংরাগ প্রকাশের শৈল্পিক দাবি হিসেবেও প্রতিষ্ঠা দিতে চান আবুল হোসেন —

কবিকে দিও না রাগিয়ে,
সে কখন কাকে ভাগিয়ে,
নিয়ে যাবে তার ছন্দে,
বাঁধবে বাক্যবন্ধে।
('কাব্যের গরু খোঁজা', *এখনও সময় আছে;* আবুল, ১৯৯৭ : ৫৩)

খ.

কবি দুঃখকে পরিহার করতে চান। তিনি গালাগালি হানাহানি রাগারাগি থেকে দূরে থাকার কথা বলেন। মানুষে-মানুষে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ থাকলে কেউ কারো প্রতি বিরূপ হবে না, কবির প্রত্যাশা এটুকুই। ক্ষোভে অপরের প্রতি প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে 'গলাবাজি' করার বিষয়টি কবির কাছে মনে হয় কাচের মতো 'ঠুনকো' ও 'ফাঁপা'। তাই নম্রতা ভদ্রতা কোমলতা এবং সর্বোপরি সবার প্রতি দিতে হবে ক্ষোভের বদলে ভালোবাসা —

গাল দেওয়া তো খুবই সহজ,
গলায় জোর থাকলে হল।
ভালোবাসার মতো কঠিন
আর কি আছে, জানলে বোলো।

গলাবাজির আওয়াজটা
কাচের চেয়েও ঠুনকো, ফাঁপা।
প্রেমের ভাষা এমন গাঢ়
ঘন, গভীর, যায় না মাপা।
('আমার কথা', *এখনও সময় আছে;* আবুল, ১৯৯৭: ২৩)

গ.

দুঃখময় জীবনে দুঃখ নিয়ে কবি অনেক লিখেছেন। তিনি দুঃখ শব্দটির খুব সাদামাঠা প্রয়োগ করেছেন কবিতায়। দুঃখ কাউকে পরোয়া করে না। দুঃখ স্বয়ম্ভর। দুঃখ কিছুরই তোয়াক্কা করে না। এই নিদারুণ দুঃখের বিষয়কে তিনি অসাধারণ পারসনিফিকেশন করেছেন, যা বাংলা কবিতায় দুঃখের ক্ষেত্রে সচরাচর দেখা যায় না —

সে যখন আসে
ডাকে না, কাশে না,
কড়াও নাড়ে না,
ঘন্টিও টেপে না।

এসে ঢুকে পড়ে।
দেখার আগেই
ঘিরে ফেলে–
পাহাড়ি সড়কে 'ফগের' মতো
শীতের রাত্রে যেমন হিম। ...

সারা ঘরবাড়ি দেখে
ছেলেমেয়ে স্ত্রীর কাছে যায়
লেখার টেবিলে কলমটা নাড়ে।
তার কথা বলা
তবুও যাবে না।
('দুঃখ', *দুঃস্বপ্ন থেকে দুঃস্বপে;* আবুল, ১৯৮৫ : ৪২)

ঘ.

দুঃখ সর্বসাধারণের মতো কবির কাছে খুব চেনাজানা। দুঃখগুলো দেখতে দেখতে সবারই গা সয়ে গেছে, তবু দুঃখ ফিরে আসে, ঘিরে আসে। দুঃখের শব্দগুলো তাই কবির মনে বিবর্ণ অনুভূতির প্রকাশ ঘটায়, তাতে গা শিরশির করে না লোমও খাড়া হয় না। দুঃখের কথা লিখে কবি পক্ষান্তরে আসলে দুঃখকেই উপেক্ষা করে চলতে চান —

দুঃখের কথায় আমি, কেন জানি,
বারবার ফিরে আসি।
কিন্তু দুঃখকে আমি কী করে ভাষা দেব?
যে সুরে যে ছন্দেই বলি
দেখি বড়বেশি চেনাজানা
ঝরামরা রঙচটা বিবর্ণ শব্দগুলো।
কাঁটা দেয়া দূরে থাক
গা শিরশির করেও ওঠে না,
লোম খাড়া হয়ে ওঠে না।
('দুঃখ নামক এক বহুরূপী', *দুঃস্বপ্ন থেকে দুঃস্বপ্নে;* আবুল, ১৯৮৫ : ৫২)

কবি গিয়েছিলেন জেনেশুনে স্রোতের বিরুদ্ধে। তাই তাঁকে হতে হয়েছে আলাদা এবং কিছুটা নিঃসঙ্গ একাকী। সেই কথা তিনি শেষের দিকের কবিতার বইয়েও স্মরণে এনেছেন —

স্রোতের বিরুদ্ধে যায় কারা?
যে নিজের কাজ করে যায়
নিজের মতন করে,
বাহবার অপেক্ষায়
বসে থাকে না যে,
কিংবা কারও চোখ-রাঙানিতে
যে নিজের ভেতরে সেঁধিয়ে
না গিয়ে লড়াই-এর
মাঠে নেমে পাঞ্জা লড়ে
একান্ত সহজে
তারা।
('বিপরীত স্রোতে', *রাজকাহিনী;* আবুল, ২০১০ : ক/স : ৩৬০)

আবুল হোসেন দিক নির্ণয় করেছিলেন *নববসন্তে*। অজানা অচেনা এক পথ নির্মাণ করে তাঁকে চলতে হবে। সেই পথ তিনি পাবেন কি না জানা নেই তবু তাঁর যাত্রা থাকবে অবিচল

অবিরাম অনায়াস। *হাওয়া, তোমার কি দুঃসাহস* কাব্যগ্রন্থে তিনি নিজেই পুনর্বার বলেছেন, সেই পথের তিনি খেই হারাননি। তিনি চলছেন তাঁর স্বপ্ন পূরণের ধারা অতিবাহিত করে। কবির ভাষ্য —

আমি তো থামতে পারব না, পারব না।
আমাকে যেতেই
হবে সেই পথে, যে পথের খেই
পাইনি এখনো,
শেষ যার নেই কোনো,
যে দিকেই চাই
সারা পথে উৎরাই,
শুধু
হাকাকার করে ধু ধু।
হয়তো সে পথ কখনো পাব না।
নেই তবু কোনো দ্বিধা ও ক্লান্তি কি অনুশোচনা।
('অন্যপথ', *হাওয়া, তোমার কি দুঃসাহস;* আবুল, ১৯৮২ : ২২)

সমাজতত্ত্বের পাশাপাশি সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে ভেবেছেন আবুল হোসেন। মানব সৃষ্টির আদিমিথকে তিনি কবিতায় নিয়ে এসেছেন। প্রবল সৃষ্টির তাড়না কোনো সংস্কারের দ্বারে বন্দি থাকে না, সৃষ্টির টানে সে বেরিয়ে আসে। *হাওয়া, তোমার কী দুঃসাহস* বইয়ের নামকবিতায় কবি সৃষ্টিতত্ত্বের সেই বিষয়টির দার্শনিক দ্যোতনাসহ উপস্থিত করেছেন। হাওয়া বা ইভ প্রচলিত সংস্কারের দড়ি ছিঁড়ে ঝাঁপ দিয়েছিলেন মানব ইতিহাস সৃষ্টির নতুন পথে। আদিমানবীর এই দুঃসাহসিকতায় সৃষ্টি হয়েছে মানবপ্রবাহ, সেই সাহসিকতাকেই কবি তাঁর সৃষ্টিশীল পথ নির্মাণের সঙ্গে মিলিয়ে একটি প্যারালালিজম তৈরি করেছেন।

একদা দিক নির্ণয়ের কথা বলেছিলেন। পথ চলার নিমিত্তে নিজের পথ তৈরি করার কথা বলেছিলেন। ধীরে ধীরে সে পথ তিনি নির্মাণও করে গেছেন। পথের শাখা নানা দিকে ছড়িয়ে গেছে। কখনো ব্যক্তির দিকে একান্তে, সমাজের দিকে সমস্বরে, রাষ্ট্র ও সমষ্টির দিকে বহুস্বরে। পথিমধ্যে বেদনা, ক্ষোভ, দুঃখ সবই এসেছে তাঁর পথ নির্মাণের গতিকে রুখে দিতে। জীবনের প্রতি অবিচল আস্থা থাকায় কোনো বাধাই বড় হয়ে দেখা দেয়নি। তিনি এগিয়েছেন। 'হাওয়া' নামের আদিমানবীর মিথকেও তিনি শেষ পর্যন্ত তাঁর বাধাবন্ধনহীন সৃষ্টিশীলতার গতিপথ হিসেবে দেখিয়েছেন। সৃষ্টির প্রতি কবির অবিচল প্রেম এখানেই চিরসুন্দর হয়ে প্রতিভাত হয়েছে —

হাওয়া, তোমার কী দুঃসাহস,
সংস্কারের দড়ি ছিঁড়ে
তুমিই ঝাঁপ দিয়েছিলে
নতুন পথে, চাওনি ফিরে

পিছন দিকে একটি বারও।
উড়িয়ে দিয়ে সব ভীরুতা

ধরিয়ে দিলে রক্তে নেশা।
তোমার পথই পথ আমারও।
('নামকবিতা', *হাওয়া, তোমার কী দুঃসাহস;* আবুল, ১৯৮২ : ২৬)

কথ্য ভাষারীতির ব্যবহার আবুল হোসেনের কবিতার নতুন সৌন্দর্য। তিনি কবিতার ভাষা আর মুখের ভাষার দূরত্ব কমিয়ে এনেছেন। প্রতিদিনের জীবনযাপনে যে ভাষা আমরা প্রয়োগ করি তার কাছ থেকেই ঋণ নিয়েছেন। শব্দের জন্য কষ্টসাধ্য সংস্কৃত রূপের ভেতর ঢুকে পড়েননি। বিষয়ও নিয়েছেন তিনি একেবারে চেনাপৃথিবীর ব্যবহার্য নানাবিধ অনুষঙ্গের আশ্রয়ে। সেজন্য জীবন ও প্রাত্যহিকতার বিবিধ বিষয় অনায়াসে স্থান নিয়েছে তাঁর কবিতায়। বহিরাঙ্গিক চাকচিক্য সৃষ্টির জন্য অভিধাননির্ভরও হতে যাননি কিংবা অতিভাষিতার মোহেও পড়েননি, নিমজ্জিত হননি সংস্কৃত ভাষাভাণ্ডারে; তাঁর প্রবণতা কষ্টার্জিত ভাষাপ্রয়োগে নয়; বরং মিতবাক ও মেদহীনতা তাঁর কবিতায় প্রকরণে এনেছে নতুন বিশিষ্টতা। অতিভাষণ কিংবা অতিউচ্ছ্বাস তিরিশের কবিরা সচেতনভাবে বর্জনের পক্ষপাতী ছিলেন। 'তিরিশের কবিদের এই শিক্ষা, সংযম ও সংহতি আবুল হোসেন স্বায়ত্ত করেছেন। আর আধুনিক বাংলা কবিতা চিরকাল যা করেছে, তা হচ্ছে গদ্যকেই কবিতা করে তোলা। আসলে তো জীবন কবিতা ও গদ্যে বিভক্ত নয় — ওতপ্রোত। কবিতা ও গদ্যের রূপকল্পই সেদিক থেকে বরং দুই কৃত্রিম প্রবাহ। বিংশ শতাব্দীর সাহিত্য এই কৃত্রিমতা ঘুচিয়ে কবিতা গদ্যের যথাসাধ্য কাছে নিয়ে আসতে চাচ্ছে, গদ্যের ভিতরে চাচ্ছে কবিতার সঞ্চার। আবুল হোসেন এই পথেরই সচেতন যাত্রিক কবিকর্মী।'(আবদুল মান্নান, ১৯৯৩ : ১৩৮)

আবুল হোসেন কবিতার অন্তরঙ্গে একেবারেই চেনাজানা যাপিতজীবনের প্রতিদিনের ঘটনাবলিকে জায়গা দিলেন, আর বহিরঙ্গে তিনি নতুন ভাষাভঙ্গি উপস্থাপনে সহজ পথের যাত্রী হলেন। সহজিয়া ধারায় যে অনবদ্য কাব্যসৌন্দর্য চিরস্থায়ী আবেদন সৃষ্টি করতে পারে, যা প্রায় উপেক্ষা করতে বসেছিলাম আমরা, তারই উদ্গাতা হলেন আবুল হোসেন। এ কাজে তিনি নিত্যব্যবহার্য অতিপরিচিত কথোপকথনের রীতিকে গ্রহণ করলেন। 'বাংলা কবিতার কথোপকথনের যে ধারাক্রম, আবুল হোসেন সেই ধারাক্রমকে গ্রহণ করবার চেষ্টা করেছিলেন। বাংলা কবিতায় উচ্ছ্বাস, আবেগ এবং উচ্চসুরকে কৌশলের সঙ্গে পরিহার করে আবুল হোসেন আধুনিককালের সময়চেতনায় আপন কবিতাকে উন্মুখর করেছিলেন।' (সৈয়দ আলী, ১৯৯৩ : ১১৬) ২০০০ সালে আবুল হোসেনের বয়স ৭৮। তখন বার করেছিলেন *কবিতাসংগ্রহ*। *সংগ্রহে*র ভূমিকায় পার করে-আসা চার দশকের কাব্যভঙ্গির অবিচল আস্থার কথা তিনি খোলাসা করে গুছিয়ে বলে যান, 'প্রায় প্রথম যৌবনে স্থির করেছিলাম যাকে আমরা সাধারণত কবিতার ভাষা বলে চিনতে অভ্যস্ত সেই ভাষা বদলে তার জায়গায় সাধারণ মানুষ কথাবার্তা বলে, কাজকম্ম সারে, কবিতায় সেই আটপৌরে মুখের কথা ও বাকভঙ্গিকে তুলে ধরার চেষ্টা করব। সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার সংকল্পে চিরকাল অবিচল থেকেছি, কখনো ক্লান্ত বোধ করিনি, তা থেকে ক্ষান্তও হইনি। কবি যে মাজাঘসা ছাঁটাই বাছাই করে শব্দ সাজান, কবিতার কথা তৈরি করেন, তা কখনো ভুলিনি,

কিন্তু লোকের চলতি কথার মধ্যেও অজান্তে একটা ছন্দ সুর, ভঙ্গি এসে যায়, সেটা সহজে চোখে পড়ে না। সব ভাষারই এই রকম একটা বৈশিষ্ট্য আছে। তাকে চিনতে, চেনাতে চেয়েছি।' (আবুল, ২০০০ : ভূমিকাংশ)। আবার ২০০৪-এ যখন বয়স ৮২; বের হয় *রাজকাহিনী* নামের কবিতার বই। এই বইয়ের 'খালি হাতে লেখা' শিরোনামের কবিতায়ও সাদাসিধে ভাষাভঙ্গির কথা স্বীকার করেন :

রঙ-বেরঙের ঘুড়ি অথবা বাহারে ফানুস উড়িয়ে
কিংবা গোলকধাঁধা তৈরি করে
পাড়া ভুলিয়ে নয়,
আমি আমার কথাটা
বলতে চেয়েছিলাম
সাদাসিধে ভাষায়।
('খালি হাতে খেলা', *রাজকাহিনী*; ক/স আবুল, ২০১০: ৩৪৭)

নববসন্ত প্রকাশের পর তিনি পরের সব কবিতার বইয়ে প্রকরণগত নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। সহজ ও সুমিত চালে বাকসংযমের ভেতর দিয়ে তিনি ছন্দের নানা রকম কাজ করেছেন কবিতায়। *বিরস সংলাপ*, *দুঃস্বপ্ন থেকে দুঃস্বপ্নে*, *হাওয়া*, *তোমার কি দুঃসাহস*, *এখনও সময় আছে*, *আর কিসের অপেক্ষা* কিংবা *রাজকাহিনী* প্রায় প্রতিটি কবিতার বইয়ে তিনি ভাষা ও ছন্দ নিয়ে নিরীক্ষাশীল ছিলেন। তবে নিরীক্ষা করতে গিয়ে তিনি কবিতাকে ছন্দপ্রধান করে তোলেননি। বিষয়, ভাষা ও ছন্দের মিলন তাঁর কবিতায় একটি সাবলীল আবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। তবে সব সময় তিনি তাঁর অনুভূতিকে ছন্দজাত করেছেন এমন নয়, গদ্য ও স্পন্দিত ছন্দের দোলাও পাওয়া যায় তাঁর অনেক কবিতায়। মুখের ভাষার অতিপরিচিত শব্দাদি প্রচলিত ছন্দে ও গদ্যছন্দে এমনভাবে জুড়ে দিয়েছেন তিনি যে একটি স্বয়ংক্রিয় কাব্যবোধ সহজেই সৃষ্টি হয় পাঠকের মনে। চেতনার দিক থেকে তিনি রূপান্তরকামী হয়েছেন মাঝে মাঝেই। তাঁর রূপান্তর ব্যক্তি থেকে সমাজ, সমাজ থেকে স্বদেশ এবং স্বদেশ থেকে বৈশ্বিক চেতনায় নতুন ডালপালা ছড়িয়ে বিকাশমান হয়েছে।

নিরপেক্ষ জীবন ও সময়ের শিল্পসঞ্চারী প্রকাশ আবুল হোসেনের কবিতা। তিনি প্রচলিত আধুনিক বাস্তবতার সঙ্গে চারপাশের বৃহত্তর বাস্তবতা এবং আত্মভাবনাজাত অধিবাস্তবতাকে কবিতায় চিত্রিত করেছেন সফলতার সঙ্গে। অতিরেক ইমাজিনেশন তাঁকে বশীভূত করেনি, কিংবা সীমারেখাহীন কল্পনাকুহক তাঁর সহজিয়া কাব্যাদর্শকে ঢেকে ফেলেনি কখনো। সমাজ, পরিবার, ব্যক্তি, পরিবেশ, জীবন, সময়, স্বপ্ন আর এসব ঘিরে আনন্দ বেদনা ব্যর্থতা সফলতার উপকরণ দিয়ে কবিতা লিখেছেন। বিশেষ কোনো আয়োজন নয়, একেবারে চোখের দেখা হৃদয়ে আঁকা পৃথিবীকে তিনি কবিতায় নিয়ে এসেছেন। তবু তা কবিতা হয়েছে, তাঁর অনন্যতা এমনই — সাধারণের ভেতর অসাধারণ শিল্প। কবি নিজে তাঁর কবিতার চূড়ান্ত কথাটি বলে যেতে ভুল করেননি, 'নিজের মনে কাজ করে গেছি। ফলের জন্য অপেক্ষা করিনি। যা দেখেছি, শুনেছি, জেনেছি, চিনেছি এবং যে আনন্দ বেদনা পেয়েছি, তার নীরব সাক্ষী এইসব কবিতা'। (আবুল, ২০০০ : ভূমিকাংশ)।

গ্রন্থপঞ্জি

অনু হোসেন (২০০৩)। 'আবুল হোসেনের সঙ্গে কথোপকথন' (গৃহীত সাক্ষাৎকার); *ভোরের কাগজ* সাময়িকী, ২২ আগস্ট ২০০৩, ঢাকা।

আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯৯৩)। *করতলে মহাদেশ*, শিল্পতরু প্রকাশনী, ঢাকা।

(২০১১)। 'আবুল হোসেনের কবিতা'; 'আবুল হোসেন-এর ডি.এইচ. রেলওয়ে'; জুনান নাশিত সম্পাদিত; *আবুল হোসেন : কবির পোর্ট্রেট*, মিজান পাবলিশার্স, ঢাকা।

আবু রুশদ (১৯৯৭)। 'কবির উত্তরণ', *দৈনিক ইত্তেফাক* সাময়িকী। জুনান নাশিত সম্পাদিত; *আবুল হোসেন : কবির পোর্ট্রেট*, মিজান পাবলিশার্স, ঢাকা।

আবুল মোমেন (২০১১)। 'ছোট ভুবনের ব্যাপ্তি', জুনান নাশিত সম্পাদিত; *আবুল হোসেন : কবির পোর্ট্রেট*, মিজান পাবলিশার্স, ঢাকা।

আবুল হোসেন (১৯৪০)। *নববসন্ত*, মুক্তধারা, ঢাকা।

আবুল হোসেন (১৯৭৭)। *নববসন্ত*, দ্বিতীয় সংস্করণ, মুক্তধারা, ঢাকা।

আবুল হোসেন (১৯৬৯)। *বিরস সংলাপ*, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা।

আবুল হোসেন (১৯৮২)। *হাওয়া, তোমার কি দুঃসাহস*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা।

আবুল হোসেন (১৯৮৫)। *দুঃস্বপ্ন থেকে দুঃস্বপ্নে*, মুক্তধারা, ঢাকা।

আবুল হোসেন (১৯৯৩)। 'আমার প্রথম বই' (স্মৃতিকথা); *মাটি*, ২য় বর্ষ ৫ম সংখ্যা, ঢাকা।

আবুল হোসেন (১৯৯৭)। *এখনও সময় আছে*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

আবুল হোসেন (২০০০)। *কবিতাসংগ্রহ*, গতিধারা, ঢাকা।

আবুল হোসেন (২০১০)। *কবিতাসমগ্র আবুল হোসেন*, মনজুরে মওলা (সম্পা.), গতিধারা, ঢাকা।

আবুল হোসেন (২০১১)। 'নজরুল ইসলাম : কিছু স্মৃতি' জুনান নাশিত সম্পাদিত; *আবুল হোসেন : কবির পোর্ট্রেট*, মিজান পাবলিশার্স, ঢাকা।

কায়সুল হক (২০১১) 'কবিতার স্বতন্ত্র রূপকার'; জুনান নাশিত সম্পাদিত; *আবুল হোসেন : কবির পোর্ট্রেট*, মিজান পাবলিশার্স, ঢাকা।

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী (২০১১)। 'আবুল হোসেন : কবি'; *আবুল হোসেন : কবির পোর্ট্রেট*, পূর্বোক্ত।

মনজুর মওলা (২০১০)। 'কবি আবুল হোসেন'; *আবুল হোসেন কবিতাসমগ্র*, মনজুরে মওলা সম্পাদিত, গতিধারা, ঢাকা।

মারুফ রায়হান (১৯৯৩)। 'আবুল হোসেনের কবিতা এবং একটি সান্ধ্য বৈঠক' (গৃহীত সাক্ষাৎকার), দৈনিক সংবাদ, ৭ অক্টোবর ১৯৯৩, ঢাকা।

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৯৭)। *জীবনানন্দ দাশ : বিকাশ-প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত*, ভারত বুক এজেন্সি, কলকাতা।

রফিকউল্লাহ খান (১৩৯০)। 'আবুল হোসেনের কবিতা', *দৈনিক ইত্তেফাক*, সাহিত্য সাময়িকী, ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯০, ঢাকা।

রশীদ করীম (২০১১)। 'আহসান হাবীব ও আবুর হোসেন'; *আবুর হোসেন : কবির পোর্ট্রেট*, পূর্বোক্ত।

শঙ্খ ঘোষ (১৯৯৬)। 'সময়ের সমগ্রতা'; *এই সময় ও জীবনানন্দ*, শঙ্খ ঘোষ সম্পাদিত, সাহিত্য অকাদেমি, নয়া দিল্লি।

শিহাব সরকার (২০১১)। 'অন্তর্গত যৌবনের কবি'; *আবুল হোসেন : কবির পোর্ট্রেট*, পূর্বোক্ত।

সৈয়দ আলী আহসান (১৯৯৩)। *আধুনিক বাংলা কবিতা : শব্দের অনুষঙ্গ*, শিল্পতরু প্রকাশনী, ঢাকা।

সৈয়দ শামসুল হক (২০০৫)। মার্জিনে মন্তব্য, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা।

সৌভিক রেজা (২০১১)। 'আর কিসের অপেক্ষা'; *আবুল হোসেন : কবির পোর্ট্রেট*, পূর্বোক্ত।